﴿ الدليل المصور الموجز لفهم الإسلام ﴾

« باللغة البنغالية »

إبراهيم أبو حرب

ترجمة:

محمد إسماعيل ذبيح الله

مراجعة:

محمد عبد القادر

أبو بكر محمد زكريا

1432 - 2011

IslamHouse.com

{পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে}

ইসলামের সচিত্র গাইড

দ্বিতীয় সংস্করণ

লেখক:

আই. এ. ইবরাহীম

অনুবাদ:

মুহাম্মদ ইসমাইল জাবীহুল্লাহ

অনুবাদ সম্পাদনা:

মো: আবদুল কাদের

আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থার নাম। এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মকে আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করবেন না। তিনি বলেন:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)

অর্থাৎ "আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছুকে ধর্ম তথা জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করবে তা কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য হবে না। আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" (সুরা আলে ইমরান: ৮৫)

আমরা মুসলিমরা অনেকেই ইসলামকে না জেনে না বুঝে সেটাকে অন্যান্য ধর্মের মতই একটি গতানুগতিক ধর্ম বলে মনে করি। যখন কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলে যে, ইসলাম ১৪০০ বছর আগের জন্য যুগোপযোগী ছিল। এখন তা যুগোপযোগী নয়। আমরা তখন তার কথার কোন জবাব দিতে সক্ষম হই না বরং, আমাদের কাছে ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে মনের মধ্যে বিভিন্ন খটকার সৃষ্টি হয়। এটা মুসলিমদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে সহজ করে দিয়েছেন। যে কেউ তার সমস্যার সমাধান একটু কষ্ট করেই ইসলামের কাছ থেকে খুঁজে নিতে পারে। এতে তেমন বেগ পেতে হয় না।

অনেকে মনে করেন, আজকের বিজ্ঞান কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কিন্তু, আসলে কি তাই? না। বরং, আল-কুরআন থেকেই বিজ্ঞানীরা অনেক সময় তাদের গবেষণার কাজে সহায়তা নিচ্ছে। তাদের নতুন নতুন আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ফলাফল কুরআন শরীফের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

আমি একদিন আমার এক বন্ধুর সাথে "কুরআন ও বিজ্ঞান" বিষয়ে কথা বলছিলাম। তিনি বললেন: কুরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যে তো মিল নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোন জায়গায় মিল নেই? তিনি বললেন: বিজ্ঞান বলছে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে বিগ-ব্যাং নামক মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে কিন্তু, কুরআন তো তা বলে না। আমি তাকে বললাম: ভাই! আসলে কুরআন নিয়ে পড়াশুনা না করার কারণে আমরা অনেকেই এ রকম কথা বলে ফেলি। অথচ, কুরআন শরীফেই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টির আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সুরা আম্বিয়ায় বলেছেন:

﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾

অর্থাৎ “অবিশ্বাসীরা (কাফিররা) কি চিন্তা করে না যে, আকাশ ও পৃথিবী একীভূত ছিল (মুখ বন্ধ ছিল) অতঃপর আমি তাদেরকে আলাদা করেছি?” (সুরা আম্বিয়া:৩০)

এই আয়াতের সাথে তো বিগ ব্যাং এর কোন বৈপরীত্য থাকল না। তবে, যখন দেখা যাবে যে, বিজ্ঞানের সাথে কুরআন শরীফের কোন বিষয় মিলছে না তখন বুঝতে হবে যে, কুরআন শরীফ যেটা বলেছে সেটাই সত্য; বিজ্ঞানীদের গবেষণা সঠিকভাবে হয় নি। বিজ্ঞানীদের গবেষণার আরও প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, বিগত দিনে এমনই প্রমাণিত হয়েছে।

ইসলাম শুধুমাত্র কুরআন বা হাদীসে উল্লিখিত বিষয়ের ভিতরেই তার পরিধি ব্যাপ্ত করে রাখে নি। বরং, সেটা যেন নিত্য-নতুনভাবে মানুষের সামনে আসতে পারে সে জন্য নতুন নতুন বিষয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য ইসলামের রয়েছে কিছু কিছু সূত্র। নতুন নতুন বিষয় সামনে আসলে সে সূত্রগুলোর আলোকে তাকে যাচাই-বাছাই করেই সিদ্ধান্ত দেবে স্কলাররা। এ ছাড়া আল্লাহ তা‘আলা চান— তার বান্দারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা ভাবনা করুক। তাই, ছোট-খাট বিষয়কে তাদের চিন্তা-ভাবনার উপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

অনেকে প্রশ্ন করেন— ইসলামে চারটা মাযহাব হল কেন?

এর উত্তর হচ্ছে— ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে উক্ত চার মাযহাবসহ অন্যান্য গ্রহণযোগ্য মাযহাবের প্রবক্তা ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। তাদের মতবিরোধ শুধু ছোটখাটো বিষয়ের উপরে। আর এটা ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত চিন্তা-ভাবনার বিকাশের কারণেই হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, উক্ত ইসলামী স্কলারদের চিন্তা-ভাবনার ও মতামতের মাঝে মতবিরোধ থাকলেও তারা একে অপরকে অত্যন্ত সম্মান করতেন।

ইমাম শাফেয়ী রহ. কথায় আসা যাক—

তিনি বলেছেন: যে ফিকহ (ইসলামি হুকুম-আহকাম) -এর ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে চায় সে যেন ইমাম আবু হানিফা রহ. এর গ্রন্থাদি পড়াশুনা করে। (আশবাহু ওয়ান নাযায়ের-ইবনে নুজাইম)

এ ছাড়া তিনি বলেছেন: (ভাবার্থে) ফিকহের ক্ষেত্রে মানুষেরা ইমাম আবু হানিফা রহ. -এর মুখাপেক্ষী।

এ বইটি অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে পারব। এ বইয়ের মধ্যে কুরআনের কিছু মিরাকল ছবির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা মহাগ্রন্থ আল কুরআন তথা ইসলামের সত্যতারই প্রমাণ বহন করে। সবশেষে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন আমাকে কুরআন ও হাদীস অনুসারে জাতিকে কিছু উপহার দেয়ার তাওফিক দান করেন এই দোয়া কামনা করে এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। দোয়া কামনায়—

তাং- ২৪শে জুলাই, ২০১০

মুহাম্মদ ইসমাইল জাবীহুল্লাহ
আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়
কায়রো, মিশর

ভূমিকা

"ইসলামের সচিত্র গাইড" বইটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে, **ইসলামের সত্যতার পক্ষে কিছু প্রমাণাদি** উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে মানুষের মুখে সচরাচর প্রচলিত কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রশ্নসমূহ হল:

- কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নাযিলকৃত গ্রন্থ—এটা ঠিক কিনা?
- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম[1] আসলেই আল্লাহ তা'আলার নবী কিনা?
- ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্ম এ কথা কি আসলেই সত্য?

এ প্রশ্নগুলোর জবাবে ছয় ধরনের প্রমাণ উপস্থাপন করে হয়েছে।

1) এখানে কুরআন শরীফের ভিতরকার কিছু বৈজ্ঞানিক মু'জিযা (মিরাকল) বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিভাগে ছবিসহ এমন কিছু বৈজ্ঞানিক সত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা দ্বারা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অথচ, চৌদ্দ শ বছর আগেই কুরআন শরীফে তা বলা হয়েছে।

2) কুরআন শরীফের সূরার মত একটি সূরা এনে দেওয়ার মত চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন কুরআন শরীফের সুরার মত একটি সূরা এনে দেয়ার। কিন্তু, কুরআন নাযিলের পর চৌদ্দ শ বছর অতিক্রম করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কেউ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসে নি। এমনকি কুরআন শরীফের ১০ শব্দ বিশিষ্ট ছোট্ট সূরা সূরাতুল কাউছারের মত সূরা নিয়ে আসতেও তারা এগিয়ে আসে নি।

---
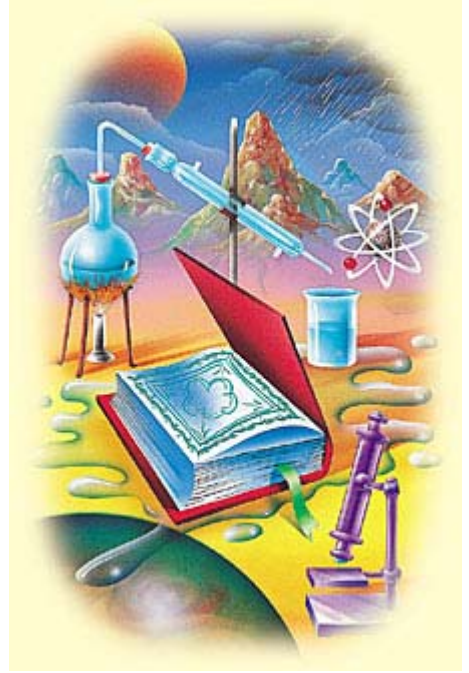
[1] এ আরবি শব্দগুলোর অর্থ: "আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্মরণকে সমুন্নত করুন এবং তাঁকে অপূর্ণতা থেকে রক্ষা করুন।"

3) বাইবেলে বর্ণিত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী। সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
4) কুরআন শরীফের কিছু আয়াতে কিছু কিছু ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটবে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যা পরবর্তীতে বাস্তবে ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ— কুরআন শরীফে পারস্য সাম্রাজ্যের উপরে রোমানদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখিত হয়েছে।
5) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে অনেকগুলো মু'জিযা সংঘটিত হয়েছে। অসংখ্য মানুষ তা চর্মচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছেন।
6) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনাড়ম্বর জীবন-যাপন প্রমাণ করে যে, তিনি দুনিয়ার ভোগবিলাস বা ক্ষমতার জন্য নবুওয়াত দাবি করেন নি।

এই সমস্ত প্রমাণাদি উপস্থাপনের পর সার-সংক্ষেপ দাঁড়ায় যে—

- নিশ্চয়ই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার আক্ষরিক বাণী; এটা তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন।
- নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী।
- ইসলাম নিশ্চিতপক্ষেই সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা।

আমরা যদি কোনো ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চেষ্টা করি তাহলে, আবেগ-অনুভূতির উপর ভিত্তি করে তা করা ঠিক হবে না। বরং, বুদ্ধি খাটিয়ে ও চিন্তা গবেষণা করে তা জানার চেষ্টা করতে হবে। সেজন্যই আল্লাহ তা'আলা যখন কোন নবী প্রেরণ করেছেন তখন তাকে মু'জিযা ও দলীল প্রমাণ দিয়েই সাহায্য করেছেন যা তাকে সত্য নবী বলে প্রমাণ করতে সহায়ক হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে **ইসলাম গ্রহণের উপকারসমূহ** উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে ইসলাম প্রদত্ত কিছু অধিকারকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন:-

১. চিরন্তন জান্নাতের পথ।

২. জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

৩. আসল সুখ ও আত্মিক শান্তি।

৪. সত্যিকার তাওবা দ্বারা বিগত জীবনের গুনাহ ক্ষমা করা।

তৃতীয় অধ্যায়ে **ইসলাম সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা** প্রদান করা হয়েছে। এখানে মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভুল সংশোধন করার জন্য ইসলামসংক্রান্ত কিছু বহুল প্রচলিত প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। যেমন:-

- সন্ত্রাস সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী?
- ইসলামে নারীদের মর্যাদা কী?
- ইসলামে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার।
- ইসলামে পরিবার ব্যবস্থা।
- মানুষের প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের সত্যতার দলীল

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার প্রিয়তম ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অনেক মু‘জিযা (আশ্চর্যজনক অলৌকিক কাজ সংঘটিত হওয়া) ও দলীল প্রমাণ দিয়ে সাহায্য করেছেন। সে দলীলসমূহ প্রমাণ করে তিনি আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে সত্য নবী। তেমনিভাবে আল্লাহ তা‘আলা আসমানি কিতাব কুরআন শরীফকে বিভিন্ন মু‘জিযা দ্বারা সত্য প্রমাণ করেছেন। উপরোক্ত দলীলসমূহ এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কুরআন মাজীদের প্রতিটি অক্ষরই মহান আল্লাহ তা‘আলার বাণী; এটা প্রণয়নের পিছনে কোন সৃষ্টি জীবের হাত নেই। বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে সে ধরণের কিছু দলীলাদি উপস্থাপিত হবে ইনশাআল্লাহ।

১. আল-কুরআনের বৈজ্ঞানিক মু‘জিযা

কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা‘আলার লিখিত বাণী। আল্লাহ তা‘আলা জিবরাইল আ. এর মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তা অবতীর্ণ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে তার অন্তরে গেঁথে ও সাহাবীদের দ্বারা লিখিয়ে নিয়েছেন। সাহাবীরা এটাকে মুখস্থ করেছেন লিখেছেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাথে উচ্চারণ করেছেন। শুধু এটুকুই শেষ নয় বরং, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি-বছর জিবরাইল আ. -কে কবার করে কুরআন মুখস্থ শোনাতেন। যে বছর তিনি মারা যান সে বছর তাকে দুইবার কুরআন শুনিয়েছেন। কুরআন নাযিল হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রচুর সংখ্যক মুসলিম তা মুখস্থ করে এর প্রতিটি শব্দকে নিজেদের অন্তরে গেঁথে নিয়েছেন। এদের অনেকে মাত্র ১০ বছর বয়সেই কুরআন মুখস্থ করতে সক্ষম হয়েছেন। কুরআন নাযিলের পর আজ পর্যন্ত কয়েকটি শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তার একটি অক্ষরেও পরিবর্তন হয় নি।
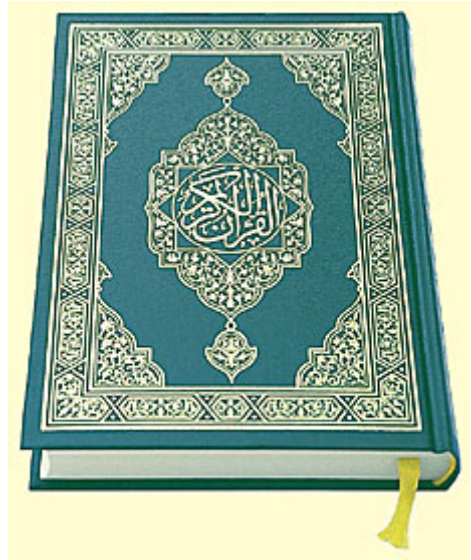
চৌদ্দ শ বছর আগে নাযিলকৃত কুরআন শরীফে এমন কিছু বৈজ্ঞানিক আলোচনা স্থান পেয়েছে যা বর্তমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এগুলোর সত্যতা প্রমাণ করেছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা। এগুলো নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার লিপিবদ্ধকৃত সত্য বাণী। যা তিনি তার প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অবতীর্ণ করেছেন; এ কিতাব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা অন্য কারো রচিত নয়। এটা দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সত্য নবী। চৌদ্দ শ বছর আগেকার কোন মানুষ বর্তমানকালের অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলো বলে দিতে পারে— এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিম্নে আপনাদের সামনে এমন কিছু বিষয়ই তুলে ধরার প্রয়াস চালাব ইনশাল্লাহ।

ক. কুরআন মাজীদ ও মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়া

কুরআন শরীফ মানুষের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)﴾

অর্থাৎ "আর আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির সারাংশ থেকে। অতঃপর আমি তাকে শুক্র-বিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্র-বিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে একটি নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা কতই না কল্যাণময়।" (আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনুন: ১২-১৪)

আরবি "الْعَلَقَةَ" (আলাকা) শব্দের তিনটি অর্থ রয়েছে।

১. জোক

২. সংযুক্ত জিনিস

৩. রক্তপিণ্ড

আমরা যদি জোককে গর্ভস্থ সন্তানের সাথে মেলাতে যাই তাহলে, আমরা দু'টির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে পাই। নিচের ১ নং ছবিতে সেটা স্পষ্ট।[2] এ অবস্থায় জোক যেমন অন্যের রক্ত খায় তেমনি উক্ত ভ্রূণ তার মায়ের রক্ত খেয়ে বেচে থাকে।[3]

দ্বিতীয় অর্থের আলোকে আমরা যদি তাকে “সংযুক্ত জিনিস” অর্থে নিই তাহলে দেখতে পাই যে, গর্ভস্থ ভ্রূণ মায়ের গর্ভের সাথে লেপটে আছে। (২ নং ও ৩ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

---

[2] *The Developing Human,* মুর ও পারসাউড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮।

[3] *Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah*, মুর ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা-৩৬।
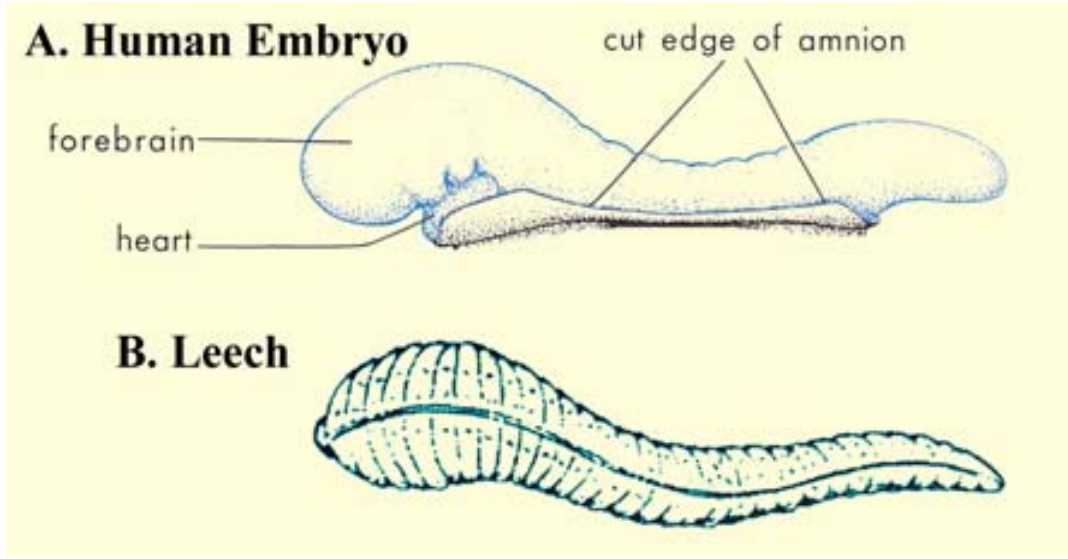
চিত্র-১ : চিত্রে জোক ও মানব ভ্রূণকে একই রকম দেখা যাচ্ছে। (জোকের ছবিটি *Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah*, মুর ও অন্যান্য, গ্রন্থের ৩৭ নং পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে যা হিকম্যান ও অন্যান্যদের প্রণিত *Integrated Principles of Zoology* গ্রন্থ হতে সংশোধিত রূপ এবং মানব দেহের চিত্রটি *The Developing Human*, ৫ম সংস্করণ, ৭৩ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে।)

চিত্র-২ : এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে উক্ত ভ্রূণটি মায়ের গর্ভের সাথে লেপটে রয়েছে। (চিত্রটি *The Developing Human*, ৫ম সংস্করণ, ৬৬ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে।)
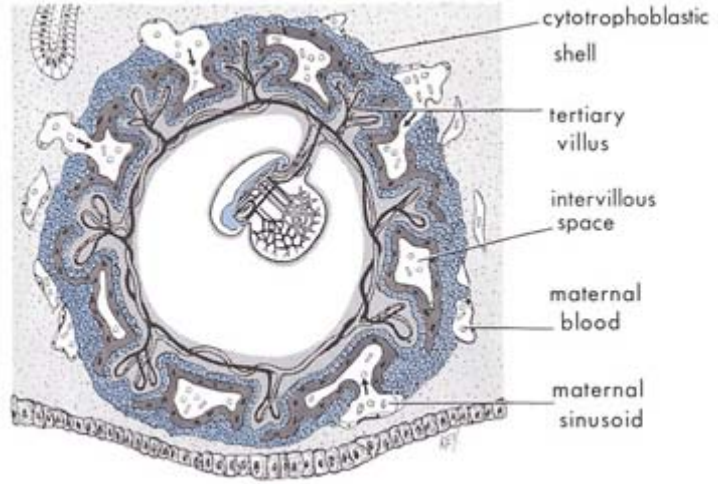
চিত্র-৩: এ চিত্রে দেখা যাচ্ছে (B চিহ্নিত) ভ্রূণটি মাতৃগর্ভে লেপটে আছে। এর বয়স মাত্র ১৫ দিন। আয়তন-০.৬ মি.মি. (চিত্রটি *The Developing Human*, ৩য় সংস্করণ, ৬৬ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে যা লেসন এন্ড লেসনের *Histology* গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে)
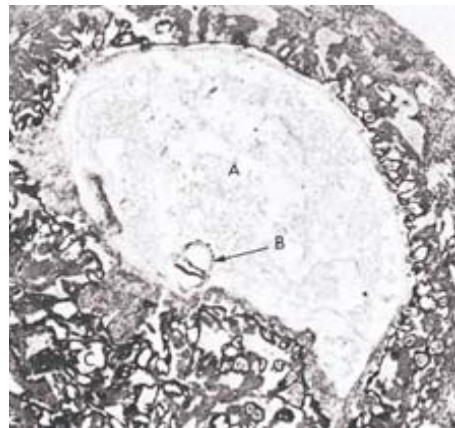
তৃতীয় অর্থের আলোকে আমরা উক্ত শব্দের "রক্তপিণ্ড" অর্থ গ্রহণ করলে দেখতে পাব যে, তার বাহ্যিক অবস্থা ও তার সংরক্ষিত খাঁচা (আবরণ) রক্তপিণ্ডের মতই দেখায়। উক্ত অবস্থায় এখানে প্রচুর পরিমাণ রক্ত বর্তমান থাকে।[4] (৪র্থ চিত্র দ্রষ্টব্য) এতদসত্ত্বেও তিন সপ্তাহ পর্যন্ত এই রক্ত সঞ্চালিত হয় না।[5] সুতরাং, বলা যায়— এ অবস্থা রক্তপিণ্ডের মতই।

চিত্র-৪ : এই চিত্রে ভ্রূণ ও তার আবরণকে তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ রক্ত বর্তমান থাকার কারণে রক্তপিণ্ডের মতই দেখাচ্ছে। (চিত্রটি *The Developing Human,* ৫ম সংস্করণ, ৬৫ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে)
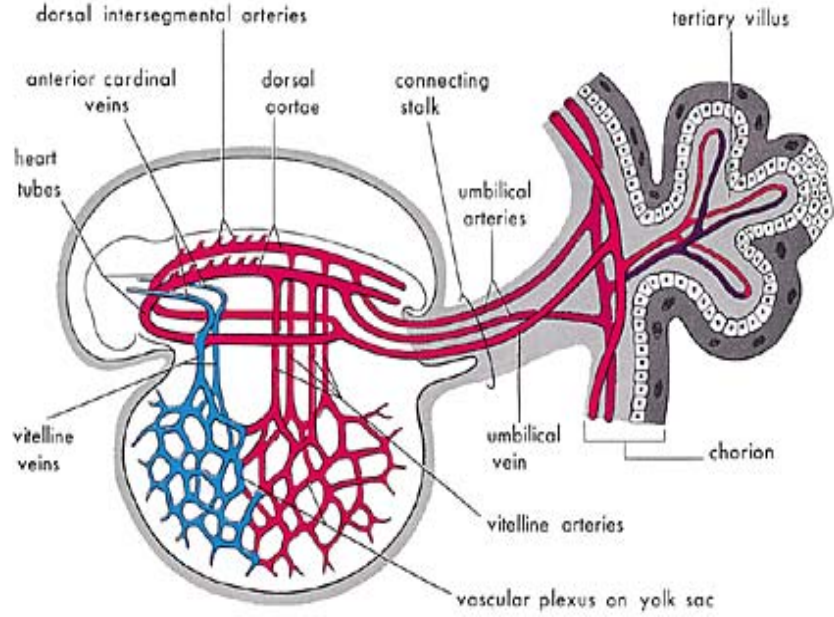
উক্ত "আলাকা" শব্দের তিনটি অর্থের সাথেই ভ্রূণের বিভিন্ন স্তরের গুণাবলি হুবহু মিলে যাচ্ছে।

কুরআন শরীফের আয়াতে উল্লেখিত ভ্রূণের ২য় স্তর হল— "مُضْغَةً" (মুদগাহ)। مُضْغَةً হল চর্বিত দ্রব্য। যদি কেউ এক টুকরা চুইংগাম নিয়ে দাতে চর্বণ করার পর তাকে ভ্রূণের সাথে তুলনা করে তাহলে, উক্ত দ্রব্যের সাথে ভ্রূণের হুবহু মিল দেখতে পাবে।[6] (৫ ও ৬ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

আজ বিজ্ঞানীরা মাইক্রোস্কোপসহ অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে এগুলো আবিষ্কার করেছে কুরআন নাযিল হওয়ার দেড় হাজার বছর পর। তাহলে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে এত কিছু জানা কেমন করে সম্ভব যখন এ সবের কিছুই আবিষ্কৃত হয় নি?

---

[4] *কুরআন-হাদীসের আলোকে মানব দেহের প্রবৃদ্ধি,* মুর ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা-৩৭ ও ৩৮।

[5] *মানবদেহের প্রবৃদ্ধি,* মুর ও পারসাউড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৬৫।

[6] *মানবদেহের প্রবৃদ্ধি,* ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮।

চিত্র-৫ : এই চিত্রটি ২৮ দিন বয়সের (মুদগাহ স্তরের) ভ্রূণের চিত্র। উক্ত চিত্রটি দাঁত দ্বারা চর্বিত লোবানের মতই দেখাচ্ছে। (চিত্রটি *The Developing Human*, ৫ম সংস্করণ, ৭২ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে)

চিত্র-৬ : এখানে চর্বিত চুইংগাম ও ভ্রূণের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে পাই। উপরের চিত্র A তে আমরা ভ্রূণের গায়ে দাঁতের মত চিহ্ন এবং চিত্র B তে চর্বিত লোবান দেখতে পাচ্ছি।
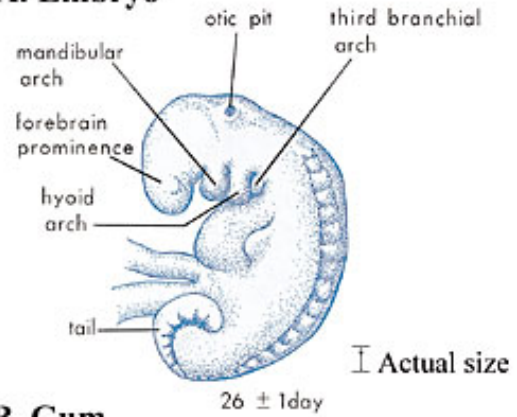
১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে হাম ও লিউয়েনহোক নামক দুই বিজ্ঞানী মাইক্রোস্কোপ দিয়ে মানুষের বীর্যের মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব (Spermatozoma) খুঁজে পান রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের এক সহস্রাধিক বছর পর। এ দুইজন বিজ্ঞানীই আগে ভুলক্রমে বিশ্বাস করেছিলেন যে, মানুষের বীর্যের মধ্যে উক্ত কোষের রয়েছে অতি সামান্য প্রক্রিয়া। নারীর ডিম্বাণুতে আসার পর তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে।[7]

আর প্রফেসর কেইথ এল. মুর বিশ্বের একজন প্রসিদ্ধ ভ্রূণ-বিজ্ঞানী এবং *মানবদেহের প্রবৃদ্ধি* গ্রন্থের লেখক; তার সাড়া-জাগানো এ বইটি বিশ্বের আটটি ভাষায় ছাপা হয়েছে। এটা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স বই। বইটি আমেরিকার বিশিষ্ট একটি গবেষণা বোর্ড কর্তৃক কোনো একক লেখকের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কেইথ এল. মুর হচ্ছেন কানাডার টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যা ও কোষ বিভাগের প্রফেসর। তিনি সেখানে মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অধীনে মৌলিক বিজ্ঞান (Basic science) বিভাগের সহকারী ডীন হিসেবে এবং আট বছর শারীরবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৮৪ সালে তিনি কানাডায় শারীরবিদ্যা বিভাগের উপর কৃতিত্বপূর্ণ স্বাক্ষর রাখার জন্য কানাডার শারীরবিদ্যা বোর্ডের পক্ষ থেকে J.C.B. পুরস্কার পেয়েছিলেন। এছাড়া তিনি Canadian and American Association of Anatomists এবং Council of the Union of Biological Sciences -সহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থায় দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৮১ সালে সৌদি আরবের দাম্মামে অনুষ্ঠিত সপ্তম মেডিক্যাল সেমিনারে তিনি বলেন: “আমার জন্য এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল যে, আমি মানব শরীরের প্রবৃদ্ধির ব্যাপারে ভালোভাবে জানতে কুরআন শরীফের সহায়তা নিতাম। আমার কাছে এটা এখন স্পষ্ট যে, এ বিষয়গুলো আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, এ সকল বিষয়ের প্রায় সব কিছুই তার মৃত্যুর কয়েকশত বছর পর আবিষ্কৃত হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার সত্য নবী।”[8]

---

[7] *মানবদেহের প্রবৃদ্ধি*, মুর ও পারসাউড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৯।

[8] This is the Truth তথা “এটাই সত্য” নামক ভিডিও ডকুমেন্টারি থেকে সংগৃহীত। এই ভিডিও ডকুমেন্টারিসহ প্রফেসর কেইথ মুরের মতামতসমূহ দেখার জন্য www.islam-guide.com/truth ভিজিট করুন।

এ সময় তাকে প্রশ্ন করা হল: তাহলে কি এর অর্থ দাঁড়ায়— "কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার বাণী?" তিনি জবাব দিলেন: "আমি এ কথা মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করি না।"

প্রফেসর মুর একটি কনফারেন্সে বলেছিলেন: "কুরআন ও হাদীসে মানবভ্রূণের বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সময়কার বিভিন্ন স্তরকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করে আলোচনা করেছে। এ পদ্ধতিগুলো অত্যন্ত চমৎকার ও বিস্তৃত অর্থ নির্দেশ করে থাকে, যা আধুনিক শরীর বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে সংগতিপূর্ণ। বিগত চার বছরে সপ্তম শতাব্দীতে নাযিলকৃত কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানবভ্রূণ নিয়ে গবেষণা করে বিস্ময়কর ফলাফল পাওয়া গেছে। এরিস্টটল ভ্রূণবিদ্যা জনক হওয়া সত্ত্বেও তিনি খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মুরগির ডিমের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখেন যে, মুরগির বাচ্চার সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় কয়েকটি স্তরে। তবে, তিনি স্তরগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছুই জানাতে পারেন নি। ধরে নেয়া যায় যে, কুরআন নাযিলের সময় ভ্রূণের এ স্তরগুলো সম্বন্ধে খুব কমই জানা ছিল; যা সপ্তম শতাব্দীতে বিজ্ঞানের কোন কিছুর উপর নির্ভর করে জানার সুযোগ ছিল না। এখানে এসে শুধু একটি মাত্র নির্ভরযোগ্য ফলাফলে আসা যায় যে, এ সমস্ত জ্ঞান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। কারণ, তিনি ছিলেন নিরক্ষর তার এগুলো জানার কথা ছিল না। এছাড়া অন্য কোথাও থেকে তার মত নিরক্ষর লোককে যে ট্রেনিং দেয়া হবে তাও ছিল অসম্ভব।[9]

খ. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও পাহাড়

একটি বই, নাম তার *Earth* (পৃথিবী)। বইটি পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক রেফারেন্স হিসেবে স্বীকৃত। "প্রফেসর ফ্রাঙ্ক প্রেস" বইটির রচয়িতাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের বিজ্ঞান-বিষয়ক উপদেষ্টা। পরবর্তীতে ১২ বছর তিনি ছিলেন ওয়াশিংটনের জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি প্রধানের দায়িত্বে। এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাহাড়ের নিচে শিকড় রয়েছে।[10] আর

---

[9] This is the Truth (ভিডিও ডকুমেন্টারি)

[10] *Earth*, Press and Siever, পৃ. ৪৩৫. আরও দেখুন, *Earth Science*, Tarbuck, and Lutgens, পৃ. ১৫৭।

শিকড়গুলো মাটির অত্যন্ত গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই শিকড়গুলো দেখতে অনেকটা পেরেকের মতই। (দেখুন: ৭, ৮, ৯ নং চিত্র)

এভাবেই আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে পাহাড়ের কথা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন:

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (٦) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (٧)﴾

অর্থাৎ “আমি কি জমিনকে বিছানা এবং পাহাড়কে পেরেকের মত করি নি?” (আল-কুরআন, সূরা আন-নাবা: ৬-৭)

চিত্র-৭ : এখানে চিত্রে দেখা যাচ্ছে মাটির নিচে পাহাড়ের গভীর শিকড় বিদ্যমান। (*Earth*, প্রেস ও সিফার:৪১৩ পৃষ্ঠা)
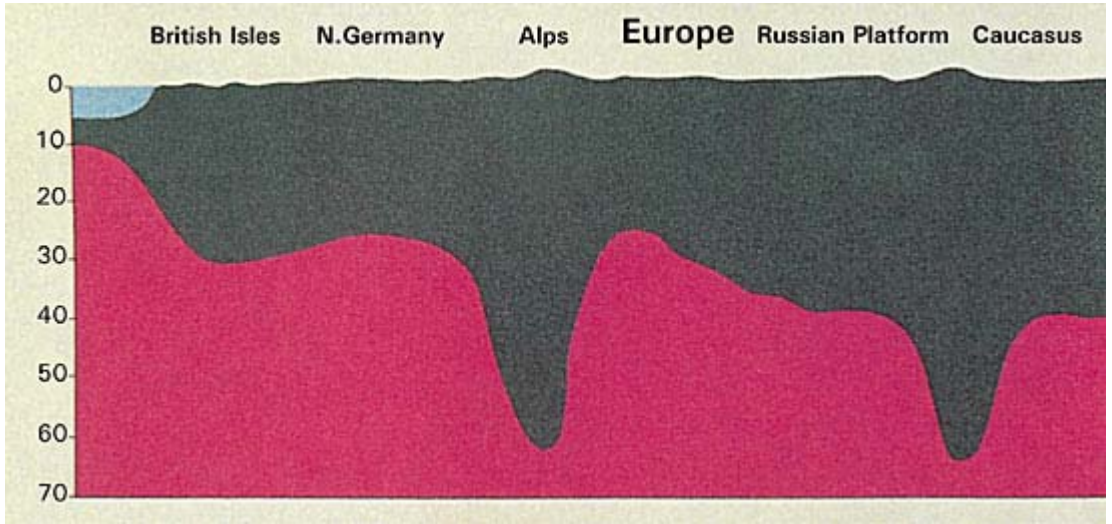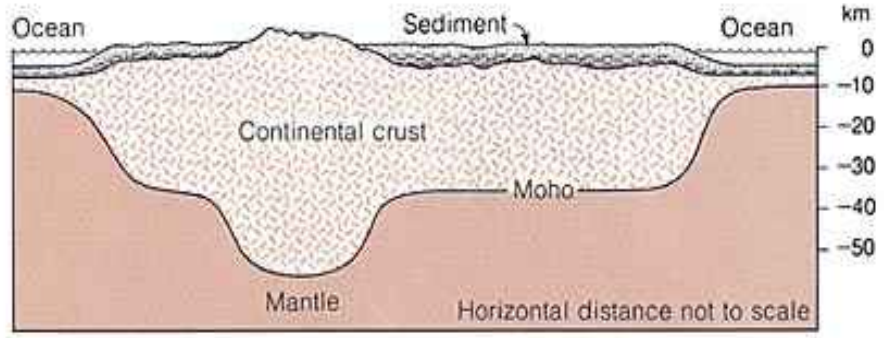
চিত্র-৮: চিত্রে পাহাড়কে পেরেকের মত দেখা যাচ্ছে মাটির গভীরে যার রয়েছে প্রোথিত শিকড়। (*Anatomy of the Earth*, ২২০ পৃষ্ঠা)
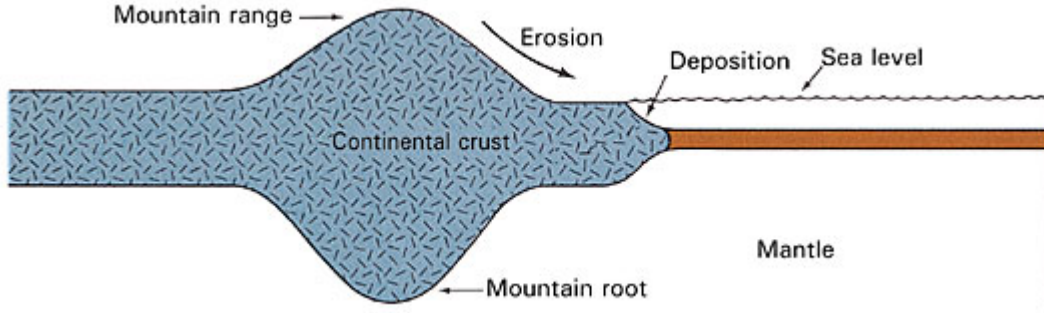
চিত্র-৯: মাটির ভিতর গভীর শিকড় থাকার কারণে পাহাড় কিভাবে পেরেকের মত রূপ নিয়েছে চিত্রটি তা ব্যাখ্যা করছে। (*Earth Science*, Tarbuck and Lutgens)

আধুনিক ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, জমিনের নিচে পাহাড়ের রয়েছে গভীর শিকড়। (৯ নং চিত্র দেখুন) সে শিকড়গুলো সমতল ভূমি থেকে পাহাড়ের যে উচ্চতা তার কয়েকগুণ পর্যন্ত হতে পারে।[11]

তাই, পাহাড়ের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে "পেরেক" শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম। কারণ, পেরেকের প্রায় সবটুকুই জমিনের ভিতর লুকিয়ে থাকে। বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পাহাড়ের এ পেরেক সংক্রান্ত তথ্যগুলো ১৮৬৫ সালে জ্যোতির্বিদ "স্যার জর্জ আইরি" র মাধ্যমে সর্বপ্রথম জানা গেছে।[12]

ভূ-পৃষ্ঠকে স্থির রাখার পিছনে পাহাড়ের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। পাহাড় ভূ-কম্পন রোধে ভূমিকা রাখে।[13] আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥)﴾

অর্থাৎ "আর তিনি পৃথিবীর উপর সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যেন কখনো তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরি করেছেন যাতে তোমরা সঠিক পথ প্রদর্শিত হতে পার।" (আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল: ১৫)

সম্প্রতি টেকটোনিক প্লেট (Tectonic plate) গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পাহাড় পৃথিবীকে স্থির রাখার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই ধারণাটা সম্প্রতি

[11] *The Geological Concept of Mountains in the Qur'an*, আল-নাজ্জার, পৃষ্ঠা-৫।

[12] *Earth,* Press and Siever, p. 435. আরও দেখুন, *The Geological Concept of Mountains in the Qur'an*, p. 5.

[13] *The Geological Concept of Mountains in the Qur'an,* p. 44-45.

বিংশ শতাব্দীর ৬০-এর দশকে টেকটোনিক প্লেটের (Tectonic plate) উপর গবেষণার আগে জানা যায় নি।[14]

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কোনো ব্যক্তির পক্ষে কি সম্ভব ছিল পাহাড়ের গঠন সম্বন্ধে জানার?! কারও পক্ষে কি এটা কল্পনা করা সম্ভব ছিল যে, তাদের চোখের সম্মুখস্থ সুদৃঢ় এ পাহাড় মাটির গভীর পর্যন্ত তার শিকড় বিস্তৃত করে রেখেছে? পাহাড়ের গভীর শিকড় রয়েছে তা আজকের বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছে। আজকের ভূ-তত্ত্ব প্রমাণ করেছে যে, কুরআনে বর্ণিত উক্ত বিষয় সত্য।

গ. কুরআন ও পৃথিবীর সৃষ্টি

বর্তমান বিজ্ঞান পৃথিবীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সৃষ্টি নিয়ে স্পষ্ট করে বলেছে যে, পৃথিবী সুদীর্ঘকাল মেঘাচ্ছন্ন ধোঁয়া ছিল। তা ছিল অধিক ঘনত্ববিশিষ্ট এবং উষ্ণ গ্যাসের সমষ্টি।[15] এগুলো পৃথিবী সৃষ্টির মৌলিক উপাদানসমূহের মধ্যকার একটি বলে আধুনিক বিজ্ঞান নিশ্চিত করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা উক্ত ধোঁয়া থেকে সৃষ্ট নতুন নতুন তারকা দেখতে পান। (দেখুন ১০ ও ১১ নং চিত্র) রাত্রে যে তারকা দেখা যায় তা আগে উক্ত ধোঁয়ার অংশ ছিল। অর্থাৎ ধোঁয়া থেকেই এগুলোর উৎপত্তি হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾

অর্থাৎ “অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ।” (আল-কুরআন, সূরা হামীম আস-সাজদাহ: ১১)

পৃথিবীর আকাশে সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি ও নক্ষত্র যেগুলোকে আমরা দেখি তার সবকিছুই ধোঁয়া থেকে তৈরি হয়েছে। অতএব, আমাদের এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, আকাশ ও

---

[14] *The Geological Concept of Mountains in the Qur’an,* p. 5.

[15] *The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe,* Weinberg, p. 94-105.

পৃথিবীর সবকিছুই পূর্বে একটি মাত্র বস্তু ছিল তারপর এগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে। উক্ত ধোঁয়ার বাইরে একটি অপরটি থেকে পৃথক হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾

অর্থাৎ "অবিশ্বাসীরা (কাফিররা) কি চিন্তা করে না যে, আকাশ ও পৃথিবী একীভূত ছিল (মুখ বন্ধ ছিল) অতঃপর আমি তাদেরকে আলাদা করেছি?" (আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া: ৩০)

বিশ্ববিখ্যাত ভূ-তত্ত্ববিদ ও জার্মানির জোহানেস-গুটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান আলফ্রেড ক্রোনার বলেন: "আমরা চিন্তা করি— মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোথা থেকে এ সব বিষয়ের জ্ঞান এসেছে? আমি নিশ্চিত যে, পৃথিবী সৃষ্টির এ মৌলিক বিষয়ের খবর জানা তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। কেননা, অল্প কিছুদিন আগে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই বিজ্ঞানীরা এগুলো সম্বন্ধে জানতে সক্ষম হয়েছে।" [16] তিনি আরও বলেন: "চৌদ্দ শ বছর আগে যে মানুষটি পারমানবিক পদার্থ সম্বন্ধে জানত না তার পক্ষে নিজের চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, আকাশ ও পৃথিবী মূলত একই পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।"[17]

চিত্র-১০ : চিত্রে গ্যাস ও ধুলোবালি (Nebula) থেকে উৎপাদিত নতুন তারকা দেখা যাচ্ছে যা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির উপাদান উক্ত ধোঁয়ার অংশ। (The Space Atlas, Heather and Henbest, পৃষ্ঠা-৫০)

[16] This is the Truth তথা "এটাই সত্য" নামক ভিডিও ডকুমেন্টারি থেকে সংগৃহীত। এই ভিডিও ডকুমেন্টারিসহ প্রফেসর আলফ্রেড ক্রোনারের মতামতসমূহ দেখার জন্য www.islam-guide.com/truth ভিজিট করুন।

[17] This is the Truth (ভিডিও ডকুমেন্টারি)।

চিত্র-১১ : মেঘের লেক (The lagoon nebula); সেটা গ্যাস ও ধুলাবালির মেঘ। এর ব্যাস ৬০ আলোকবর্ষ। উচ্চতাপ সম্পন্ন তারকার অতি বেগুনী রংয়ের রশ্মি বিকিরণের ফলে এটি উত্তেজিত হয়। সম্প্রতি গবেষণায় তা প্রমাণিত হয়েছে। (Horizons, Exploring The Universe, Seeds, plate 9, from Association of Universities for Research In Astronomy, Inc)

ঘ. আল-কুরআন ও মানুষের মগজ

আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতে বাধা দানকারী একজন নিকৃষ্ট মুশরিক সম্বন্ধে বলেন:

﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٥) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦)﴾

অর্থাৎ "...কক্ষনো নয়। (খবরদার!) সে যদি বিরত না হয় (রাসূলের সালাতে বাধা দান থেকে) তবে, আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেচড়াবই। মিথ্যাচারী পাপী কেশগুচ্ছ।" (আল-কুরআন, সূরা আল-আলাক: ১৫-১৬)

"نَاصِيَةٍ" শব্দের অর্থ হচ্ছে মাথার কপাল। প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, আল্লাহ তা'আলা আয়াতে কপালের কথা প্রসঙ্গে কেন বললেন যে, সেই কপাল মিথ্যাবাদী ও

পাপী? কেন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন না যে, ব্যক্তিটি মিথ্যাবাদী ও পাপী? মাথার কপাল, মিথ্যা ও পাপের মধ্যে সম্পর্ক কি?

আমরা যদি কপাল ও মাথার খুলির দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, কপালের সামনের দিকেই মগজের অবস্থান। (১২ নং চিত্র দেখুন) আসুন! দেখি শরীর-বিজ্ঞান মাথার সামনের দিকের কাজকর্ম সম্বন্ধে কি বলে? Essentials of Anatomy & Physiology তথা "শারীরবিদ্যার মৌলিক উপাদান" গ্রন্থের লেখক এই অংশের কাজ সম্বন্ধে বলেন: "কোন কিছু করার জন্য পরিকল্পনা, দূরদৃষ্টি ও উৎসাহ-উদ্দীপনা ইত্যাদি **কপালের সামনের এই স্থান** থেকেই উৎপন্ন হয়। আর এখানেই বহিরাবরণ সমূহের সম্মিলন ঘটেছে।..."[18] লেখক আরও বলেন: "কোন কিছু করার প্রতি প্রেরণা দানে কপালের অবদান থাকার কারণে তিনি বিশ্বাস করেন যে, মাথার কপাল কারও সাথে শত্রুতা করার মেইন পয়েন্ট বা কেন্দ্রবিন্দু।"[19]

সুতরাং, মগজের স্থানটাই পরিকল্পনা, কোনকিছু করতে প্রেরণাদান, ভাল ও খারাপ কাজের দিকে ধাবিত করা ইত্যাদির জন্য দায়ী। মিথ্যা বা সত্য বলার ক্ষেত্রেও তার অবদান রয়েছে। তাই, মানুষ যখন মিথ্যা বলে বা পাপকাজ করে তখন মিথ্যা ও পাপ কাজের জন্য মাথার কপালকে দায়ী করাই শ্রেয়। যেমনটিই আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে উল্লেখ করেছেন: ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٥) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦)﴾

অর্থাৎ "...কক্ষনো নয়। (খবরদার!) সে যদি বিরত না হয় (রাসূলের সালাতে বাধা দান থেকে) তবে, আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেচড়াবই। মিথ্যাচারী পাপী('র) কেশগুচ্ছ।" (আল-কুরআন, সূরা আল-আলাক: ১৫-১৬)

---

[18] *Essentials of Anatomy & Physiology*, Seeley and others, p. 211. আরও দেখুন, *The Human Nervous System*, Noback and others, p. 410-411.

[19] *Essentials of Anatomy & Physiology*, Seeley and others, p. 211.
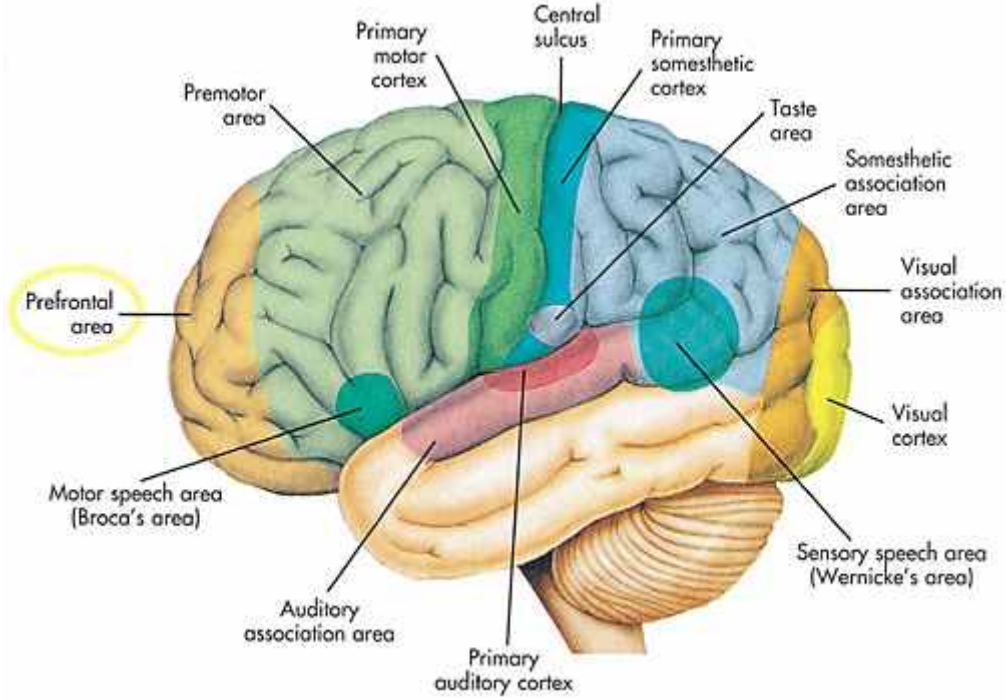
চিত্র-১২ : চিত্রে বাম দিকের অর্ধেকটাই মগজ। আর মগজের সামনেই রয়েছে কপাল। (*Essentials of Anatomy & Physiology*, Seeley and others, p. 210.)

মাথার কপালের এ সমস্ত কাজকর্মের কথা, কেইথ এল. মুরের কথানুসারে, বিগত ৬০ বছরের মধ্যে জানা গেছে।[20]

ঙ. কুরআন ও নদী-সমুদ্র

আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, যে সব স্থানে ভিন্ন দুটি সমুদ্র একত্রিত হয়েছে সে সমস্ত স্থানে দুটি সমুদ্রের মাঝে (অদৃশ্য) অন্তরাল রয়েছে যা সমুদ্রদ্বয়ের ভিতর পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং উভয়ের মাঝে নিজ নিজ গভীরতা, লবণাক্ততা ও ঘনত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে।[21] উদাহরণস্বরূপ, ভূমধ্যসাগর তারেক পাহাড় বা জিব্রাল্টার হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। আটলান্টিক মহাসাগরের ভিতরে তা কয়েকশত মাইল পর্যন্ত বয়ে গেছে প্রায় ১০০০ মিটার গভীরতাসহ। অথচ, তার ভিতরে বর্তমান রয়েছে নিজ নিজ উষ্ণতা, লবণাক্ততা ও ঘনত্বসহ অন্য সব গুণাবলি। এর পুরো স্থানেই রয়েছে ভূমধ্যসাগরের পানি।[22] (১৩ নং চিত্র দেখুন)

---

[20] *ই'জাযুল ইলমী ফিল নাসিয়াহ,* মুর ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা-৪১

[21] *Principles of Oceanography*, Davis, p. 92-93.

[22] *Principles of Oceanography,* Davis, p. 93.
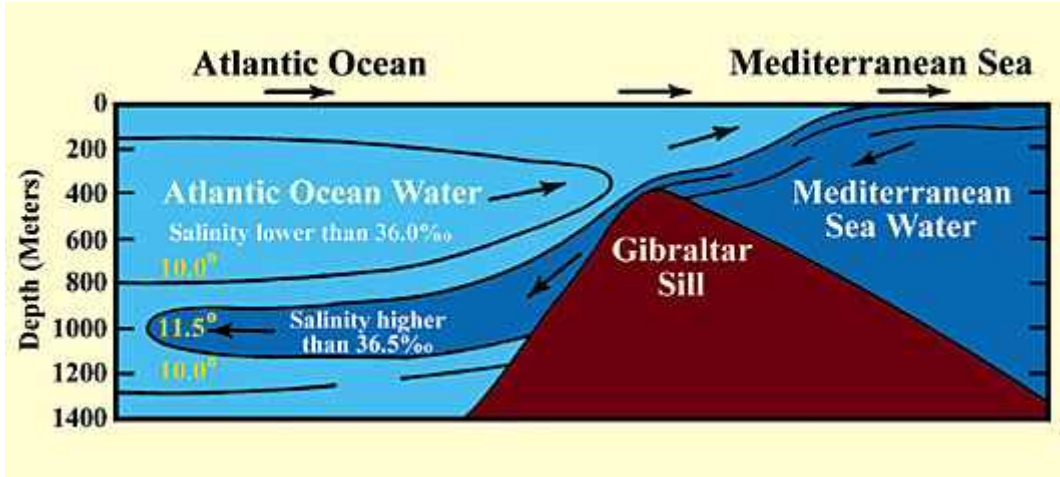
চিত্র-১৩ : ভূমধ্যসাগরের পানি তারেক পাহাড় (জিব্রাল্টার) হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করেছে নিজ গুণাবলি তথা নিজস্ব উষ্ণতা, লবণাক্ততা ও ঘনত্ব সহ। এমনটি হয়েছে উভয়ের মধ্যকার অন্তরালের কারণে। চিত্রের তাপমাত্রা সেলসিয়াস ডিগ্রিতে। (*Marine Geology*, Kuenen, p.43 সামান্য উন্নতিসহ)

এ সব সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গমালা , প্রবল স্রোত ও জোয়ার ভাটা থাকা সত্ত্বেও তাদের পানি একত্রিত হয় না এবং তাদের মধ্যকার অন্তরালকে অতিক্রম করে না।

আল্লাহ তা'আলা এই অন্তরাল সম্বন্ধে বলেন, পাশাপাশি বয়ে যাওয়া দুই সমুদ্র তাদের মধ্যকার অন্তরালকে অতিক্রম করে না। কোরআন মাজীদে এসেছে:

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠)﴾

অর্থাৎ "তিনি পাশাপাশি দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল। তারা তাকে অতিক্রম করে না।" (আল-কুরআন, সূরা আর-রহমান: ১৯-২০)

তবে, কোরআনে যখন মিষ্টি ও লবণাক্ত পানির ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে তখন উভয়ের মধ্যকার অন্তরালের সাথে সাথে 'প্রতিবন্ধক বাধা'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴾

অর্থাৎ "তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন একটি মিষ্টি, তৃষ্ণা নিবারক এবং একটি লোনা, বিস্বাদ; উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায় ও দুর্ভেদ্য আড়াল।" (আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরকান: ৫৩)

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন— “কেন আল্লাহ তা'আলা মিষ্টি ও লবণাক্ত পানির মধ্যকার অবস্থা সম্বন্ধে অন্তরালের সাথে পর্দা তথা বাধার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু দুই সমুদ্রের মাঝখানের অবস্থা সম্বন্ধে অন্তরালের সাথে বাধার কথা উল্লেখ করেন নি?”

আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, নদী সমূহের একত্রিত হওয়ার স্থান তথা মোহনায় যেখানে মিষ্টি ও লবণাক্ত পানির সম্মিলন ঘটে সেখানকার অবস্থা দুই সমুদ্রের সম্মিলন স্থলের অবস্থা থেকে পুরোপুরি ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রমাণিত হয়েছে যে, মোহনাস্থলে মিষ্টি পানি ও লবণাক্ত পানির ঘনত্বে রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য; যা তাদের দুটি স্তরকে মিশে যাওয়া থেকে বাধা দান করে। আর এই পার্থক্যস্থলের
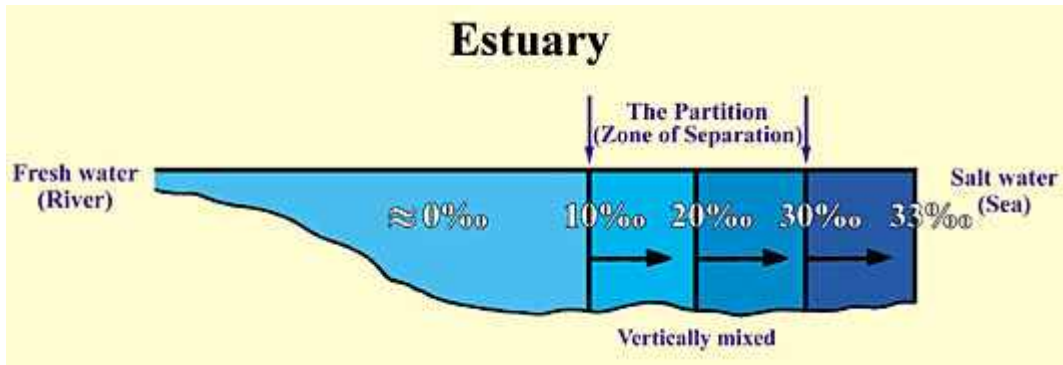
লবণাক্ততার মাত্রা বাকি অংশের মিষ্টি ও লবণাক্ত পানির বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্ন হয়।[23] (দেখুন ১৪ নং চিত্র)

চিত্র-১৪: উপরের চিত্রটি মোহনাস্থলের লবণাক্ততার মাত্রা দেখাচ্ছে। (হাজার ভাগের এক ভাগ ‰ হিসেবে) আমরা এখান থেকে মিষ্টি ও লবণাক্ত পানির পার্থক্যস্থল দেখতে পাই। (*Introductory Oceanography*, Thurman, p. 301, সামান্য পরিবর্তনসহ)

সাম্প্রতিক সময়ে এটা আবিষ্কৃত হয়েছে অত্যাধুনিক তাপ, লবণ, ঘনত্ব ও অক্সিজেন-মাপক যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা চালানোর পর। কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় দুই সমুদ্রের মধ্যকার উক্ত বাধা বা প্রতিবন্ধককে খালি চোখে দেখা। সেগুলো দেখলে আমাদের কাছে মনে হবে সমুদ্র একটিই দু'টি নয়। অনুরূপভাবেই খালি চোখে নদী ও সমুদ্রের মোহনাকেও মিষ্টি পানি, লবণাক্ত পানি ও প্রতিবন্ধক এই তিনভাগে ভাগ করা অসম্ভব।

[23] *Oceanography*, Gross, p. 244, এবং *Introductory Oceanography*, Thurman, pp. 300-301.

চ. কুরআন, গভীর সমুদ্র ও আভ্যন্তরীণ উর্মিমালা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলেন:

﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (٤٠)﴾

অর্থাৎ "অথবা তাদের কর্ম সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের পর এক অন্ধকার। যখন সে হাত বের করে তখন তাকে একেবারেই দেখতে পারে না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না তার কোনোই জ্যোতি নেই। (আল-কুরআন, সূরা আন-নুর: ৪০)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সমুদ্র ও মহাসাগরের মধ্যকার অন্ধকারের বর্ণনা দিয়েছেন। সমুদ্রের তলদেশে কোন মানুষ হাত বের করলে তার কিছুই দেখতে পাবে না। সমুদ্র ও মহাসাগরে প্রায় ২০০ মিটারের নিচে সাধারণত কোন আলোই থাকে না। সেখানে থাকে শুধুই অন্ধকার। (দেখুন ১৫ নং চিত্র) এ ছাড়া ১০০০ মিটারের নিচে কোন আলোর চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না।[24] তবে, কোন মানুষ আধুনিক সরঞ্জামাদি ও সাবমেরিনের সহায়তা ছাড়া পানির ৪০ মিটারের নিচে যেতে পারে না।

[24] *Oceans*, Elder and Pernetta, p. 27.
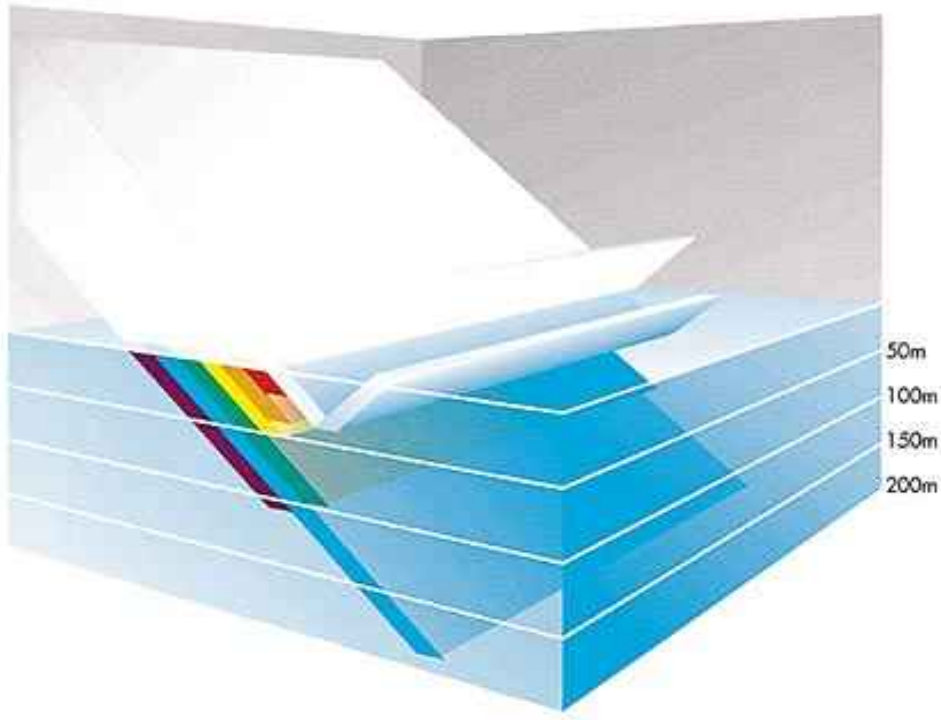
চিত্র-১৫: শতকরা ৩ থেকে ৩০ ভাগ সূর্যের আলো সমুদ্রের উপরিভাগে প্রতিবিম্বিত হয়। তখন একের পর এক আলোর সাতটি রঙ শুষতে শুষতে সবুজ রঙ ছাড়া অন্যান্য রঙ প্রথম ২০০ মিটার গভীর পর্যন্ত যায়। (মহাসাগর, পৃষ্ঠা-২৭)

বিজ্ঞানীরা আধুনিক প্রযুক্তি ও সাবমেরিনের সহায়তায় মহাসাগরের গভীরে অন্ধকারকে প্রমাণ করেছেন।

উপরোক্ত আয়াত থেকে আমরা আরেকটা বিষয় বুঝতে পারি, সেটা হল— সাগর ও মহাসাগরের গভীরস্থ পানি ঢেউ দ্বারা ঢাকা থাকে তার উপরেও থাকে অন্য ঢেউ। এটা সত্য যে, উক্ত দ্বিতীয় প্রকার ঢেউ হচ্ছে সমুদ্রের উপরিভাগের ঢেউ যা মানুষ দেখতে পায়। কারণ, কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে দ্বিতীয় ঢেউয়ের উপর রয়েছে মেঘ। তাহলে, প্রথম ঢেউয়ের বিষয়টা কি? সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছেন যে, সমুদ্রের ভিতরে আরও ঢেউ রয়েছে; যেগুলো "বিভিন্ন স্তরের ঘনত্বের ভিন্নতার কারণে এর সৃষ্টি হয়।"[25] (দেখুন, চিত্র-১৬)

---

[25] *Oceanography*, Gross, p. 205.
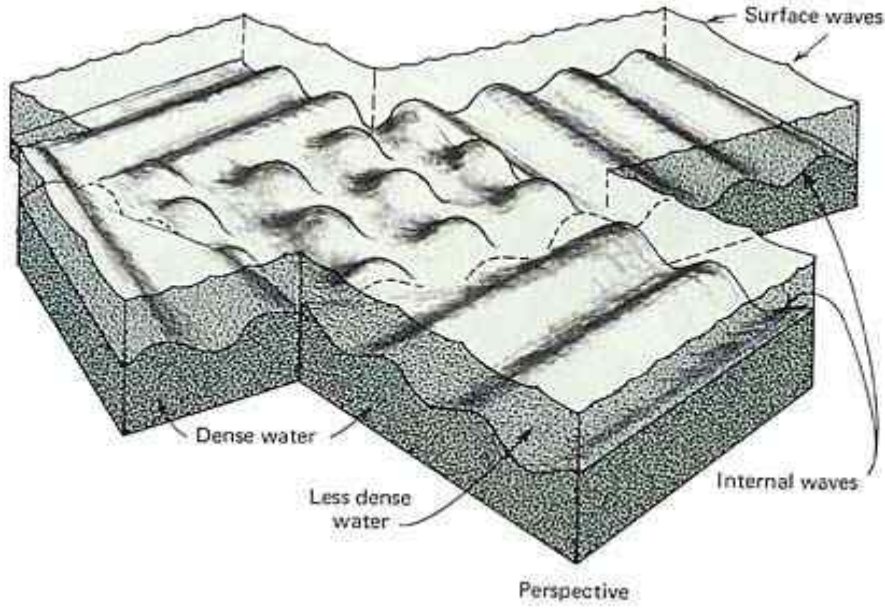
চিত্র-১৬: চিত্রে দু'স্তরের ভিন্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট পানির আভ্যন্তরীণ ঢেউ। একটি বেশি ঘনত্ব বিশিষ্ট (নিচে) এবং অপরটি একটু কম ঘনত্ব বিশিষ্ট (উপরে)(মহাসাগর জ্ঞান, পৃষ্ঠা-২০৪, Oceanography)

ভিতরের ঢেউ সাগর ও মহাসাগরের নিম্নদেশের পানিকে ঢেকে রাখে। কারণ, নিম্নদেশের পানির ঘনত্ব উপরস্থ পানির ঘনত্বের চেয়ে বেশি। এবং উপরের ঢেউ যে কাজ করে নিম্নদেশের ঢেউয়ের কাজ ও তাই। উপরের ঢেউয়ের মত নিম্নদেশের ঢেউ ও আশে পাশের স্থাপনা ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম। তবে, পার্থক্য হচ্ছে- উপরের ঢেউয়ের মত নিম্নদেশের ঢেউ মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। এবং এটা শুধুমাত্র তাপ ও লবণাক্ততা পরিবর্তনকারী বিষয়ের ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট স্থানে গবেষণার মাধ্যমেই জানা সম্ভব হবে।[26]

ছ. কুরআন ও মেঘমালা

বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরণের মেঘমালার উপর গবেষণা করেছেন। তারা প্রমাণ করেছেন যে, বৃষ্টিবাহী মেঘ নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়। তা গঠিত হয় নির্দিষ্ট প্রকারের বাতাস ও মেঘ দ্বারা। এক প্রকার মেঘের নাম "সাহাবুর রুকাম" তথা "মেঘপুঞ্জ" "Cumulonimbus"। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা উক্ত মেঘের গঠন, বৃষ্টি, শিলা ও

[26] *Oceanography*, Gross, p. 205.

বিজলি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তারা প্রমাণ করেছেন যে, উক্ত মেঘপুঞ্জ বৃষ্টি তৈরির জন্য নিম্নের প্রক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন করে থাকে:

1) **বাতাস কর্তৃক মেঘকে ধাক্কা দেয়া:** ছোট মেঘখণ্ডকে বাতাস যখন ধাক্কা দেয় তখন Cumulonimbus বা "বৃষ্টিবাহী মেঘপুঞ্জ" নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে তৈরি হতে শুরু করে। (১৭ ও ১৮ নং চিত্র দেখুন)
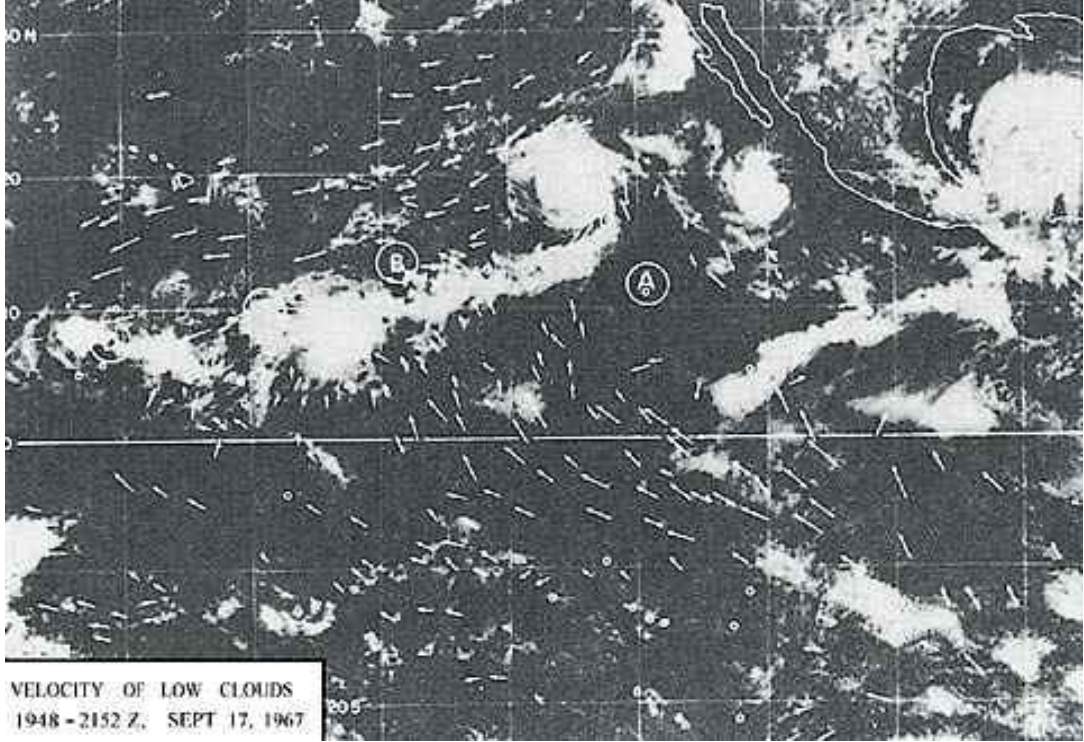
চিত্র-১৭: স্যাটেলাইট থেকে নেয়া ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, মেঘ B, C ও D এর মিলন স্থলের দিকে ঘূর্ণায়মান। তীর চিহ্নগুলো বাতাসের গতিপথ নির্দেশ করছে। (*The Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting*, Anderson and others, p.188.)

চিত্র-১৮: মেঘের ছোট ছোট টুকরা (স্তূপীকৃত মেঘমালা Cumulus) ছুটাছুটি করছে শেষ প্রান্তের বড় মেঘখণ্ডের উদ্দেশ্যে। (*Clouds and storms.* Ludlam, plate 7.4)

2) **মেঘখণ্ডের মিলন:** ছোট ছোট মেঘখণ্ড একসাথে মিলিত হয়ে বড় মেঘমালায় পরিণত হয়।[27] (দেখুন ১৮ ও ১৯ নং চিত্র)

---

[27] দেখুন, *The Atmosphere*, Anthes and others, p. 268-269, এবং *Elements of Meteorology*, Miller and Thompson, p. 141.
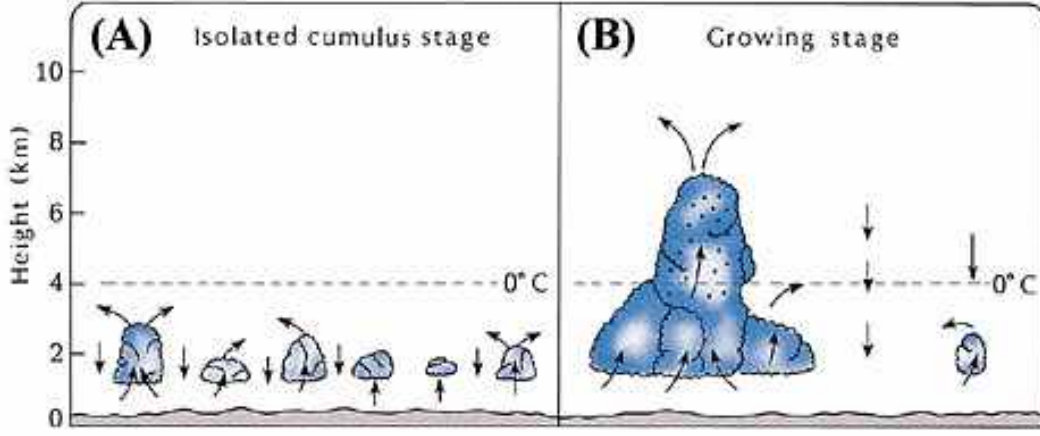
চিত্র-১৯: (A) বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট মেঘমালা একত্রিত হয়ে বড় মেঘে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। (B) ছোট ছোট মেঘ কণাগুলো একত্রিত হয়ে বড় মেঘমালায় পরিণত হয়েছে। পানির ফোটা (*) চিহ্নিত। (*The Atmosphere*, Anthes and others, p. 269)

3) **স্তূপ করে রাখা:** যখন ছোট ছোট মেঘখণ্ড একত্রে মিলিত হয় তখন তা উঁচু হয়ে যায় এবং উড্ডয়মান বাতাসের গতি পার্শ্ববর্তী স্থানের তুলনায় মেঘের মূল কেন্দ্রের নিকটে বৃদ্ধি পেয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়। এই উড্ডয়মান বাতাসের গতি মেঘের আকার বৃদ্ধি করে মেঘকে স্তূপীকৃত করতে সাহায্য করে। (দেখুন-১৯.B, ২০ ও ২১নং চিত্র) এই মেঘের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে মেঘটি বায়ুমণ্ডলের অধিকতর ঠাণ্ডা স্থানের দিকে বিস্তৃতি লাভ করে সেখানে পানির ফোটা ও বরফের সৃষ্টি করে এবং তা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। এরপর যখনই এগুলো অধিক ওজন বিশিষ্ট হয়ে যায় তখন বাতাস আর তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে, মেঘমালা থেকে তা বৃষ্টি ও শিলা হিসেবে বর্ষিত হয়।[28]
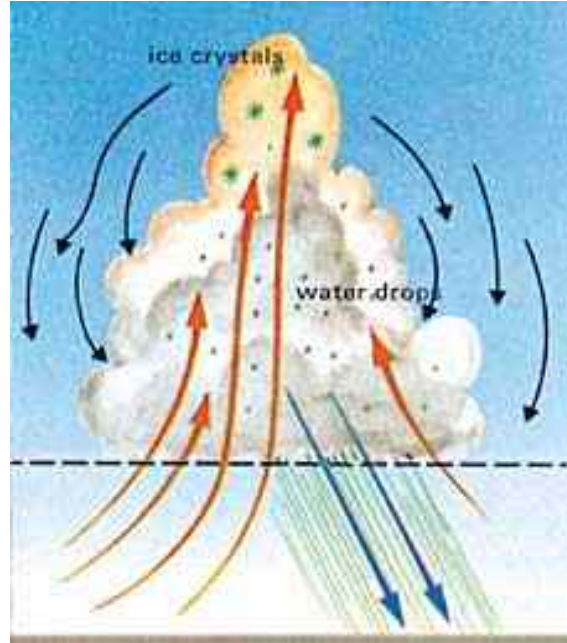
[28] দেখুন, *The Atmosphere*, Anthes and others, p. 269, এবং *Elements of Meteorology*, Miller and Thompson, pp. 141-142.

চিত্র-২০: ছোট ছোট মেঘখণ্ড একত্রিত হয়ে গঠিত "বৃষ্টিবাহী cumulonimbus মেঘপুঞ্জ" থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে। (Weather and Climate, Bodin, p.123)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾

অর্থাৎ "তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ তা'আলা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন? তারপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, এরপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন? অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা বর্ষিত হয়।" (আল-কুরআন, সূরা আন-নূর: ৪৩)

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা অতি সম্প্রতি কম্পিউটার, বিমান, স্যাটেলাইট সহ বায়ুর চাপ, আর্দ্রতা পরিবর্তন প্রভৃতি নিয়ে গবেষণার যন্ত্রপাতিসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মেঘের সৃষ্টি, গঠন প্রণালী ও তার কাজ-কর্ম সম্বন্ধে জেনেছেন।[29]

মেঘ ও বৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করার পর কুরআন বরফ ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (٤٣)﴾

অর্থাৎ "আর তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলা বর্ষণ করেন। এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা সরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক যেন তার দৃষ্টিশক্তিকে বিলীন করে দিতে চায়।" (আল-কুরআন, সূরা আন-নুর: ৪৩)

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, cumulonimbus তথা বৃষ্টিবাহী মেঘপুঞ্জ, যা থেকে শিলা-বৃষ্টি বর্ষিত হয়— তার উচ্চতা ২৫০০০ থেকে ৩০০০০ ফুট (৪.৭ থেকে ৫.৭ মাইল) পর্যন্ত হয়ে থাকে।[30] তাকে পাহাড়ের মতই দেখায় যেমনটি আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ﴾ অর্থাৎ "আর তিনি আকাশস্থিত পাহাড় (শিলাস্তূপ) থেকে শিলা বর্ষণ করেন।" (দেখুন চিত্র-২১)

---

[29] *ই'জাজুল কুরআনিল কারীম ফি ওয়াসফি আনওয়া'ইর রিয়াহি ওয়াস সাহাবি ওয়াল মাত্বার,* ম্যাকি ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা-৫৫।

[30] *Elements of Meteorology*, Miller and Thompson, p. 141.

চিত্র-২১ : Cumulonimbus Cloud বা বৃষ্টিবাহী মেঘ। (*A Colour Guide to Clouds*, Scorer and Wexler, p. 23)

এই আয়াত নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে— আয়াতে বরফের দিকে নির্দেশ করে "سَنَا بَرْقِهِ" (তার বিদ্যুৎঝলক) বলা হল কেন? তাহলে কি তার অর্থ দাঁড়ায় যে, শিলাই বিদ্যুৎঝলক সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা রাখে? আসুন! আমরা দেখি *Meteorology Today* গ্রন্থ এ সম্বন্ধে কি বলে। উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে— বরফ পড়ার দ্বারা মেঘে বৈদ্যুতিক চার্জের সৃষ্টি হয়। পানি ফোটার সাথে বরফের সামান্য সংস্পর্শ পেয়েই জমাট বেঁধে তাতে গোপন তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়। আর বরফ টুকরার কারণে উক্ত বরফ পৃষ্ঠে সমুদ্র পৃষ্ঠের চেয়ে বেশি তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া এখানে আরেকটা আশ্চর্যজনক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়; তাহলো— এখানে বিদ্যুৎ অধিক ঠাণ্ডা থেকে অধিক গরমে পরিণত হয়ে নেগেটিভ চার্জের সৃষ্টি করে। এমনভাবে ঠাণ্ডা পানির ফোটার সাথে
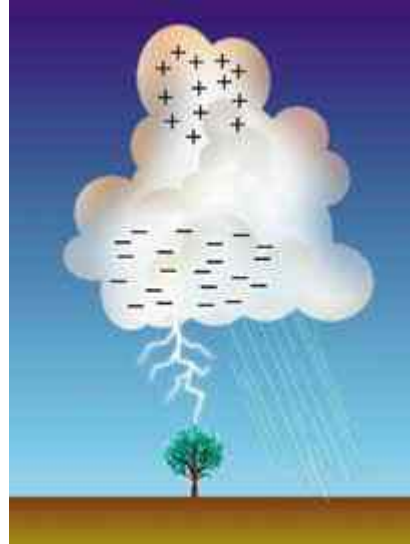
বরফের সংস্পর্শের পর এর ছোট ছোট কণাগুলো পজিটিভ চার্জ হয়ে ঊর্ধ্বগামী বাতাসের মাধ্যমে মেঘের উপরে চলে যায় এবং অন্য শিলাগুলো নেগেটিভ চার্জ হয়ে মেঘের নিচের দিকে চলে আসে। এখানে মেঘের নিচের অংশেও নেগেটিভ চার্জ হয়। আর এই নেগেটিভ চার্জই বিদ্যুৎ হয়ে প্রজ্বলিত হয়।[31] সারকথা হল- শিলাই বিদ্যুৎ সৃষ্টির প্রধান উপকরণ।

অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎঝলক সম্বন্ধে এ সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করেছেন। প্রায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দার্শনিক এরিস্টটলের তত্ত্বই সারা পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। তিনি বলেছিলেন: বায়ুমণ্ডল দু'টি নিঃশ্বাসের সম্মিলনের ফলাফল: আর্দ্র ও শুকনো। তিনি আরও বলেছেন: বজ্রধ্বনি হল শুকনা নিঃশ্বাসের সাথে অত্যাচারী মেঘের সংঘর্ষের ফল। আর বিদ্যুৎঝলক হল ভীতিকর আগুনের মত করে শুকনা নিঃশ্বাসকে পুড়ে যাওয়া।[32] এগুলো মহাকাশ সংক্রান্ত তথ্যাদির মধ্যকার কিছু তথ্য; যা ১৪০০ বছর আগে কুরআন নাযিলের সময়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

জ. কুরআনের বৈজ্ঞানিক মু'জিযা: বিজ্ঞানীদের মতামত

কুরআন শরীফের বৈজ্ঞানিক মু'জিযা বা মিরাকল সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কিছু বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হল। এগুলো *This is the Truth* নামক ভিডিও ডকুমেন্টারি থেকে সংকলিত হয়েছে। এই ভিডিওতে আপনি ওই সমস্ত বিজ্ঞানীদের নিম্নোক্ত মন্তব্যসমূহের দেখতে ও শুনতে পারবেন। (অনলাইনে এই ভিডিওটেপটির কপি পেতে বা অনলাইনে তা দেখতে চাইলে www.islam-guide.com/truth ব্রাউজ করতে পারেন।)

1) ড. টি. ভি. এন. পারসাউড: তিনি মানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়, উইনিপেগ, মানিটোবা, কানাডা- এর এনাটমি বা শারীরবিদ্যা, শিশু স্বাস্থ্য, মহিলা রোগ, প্রসূতি ও যৌনরোগ বিভাগের অধ্যাপক। তিনি ওখানে এনাটমি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন ১৬ বছর। এ সেক্টরে অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব, তিনি ২২ টি বইয়ের লেখক ও সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া তার ১৮১ টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯১

[31] *Meteorology Today*, Ahrens, p. 437.

[32] The Works of Aristotle Translated into *English*: Meteorologica, vol. 3, Ross and others, pp. 369a-369b.

সালে তিনি কানাডার এনাটমি বা শারীরবিদ্যা বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রদত্ত J.C.B. নামক বিখ্যাত পুরস্কার পেয়েছিলেন।

যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল— তার নিজের গবেষণায় প্রমাণিত কুরআন শরীফের বৈজ্ঞানিক মু'জিযা বা মিরাকল সম্বন্ধে, তখন তিনি বললেন: "আমার কাছে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন অতি সাধারণ প্রকৃতির মানুষ। তিনি পড়তে বা লিখতে জানতেন না এবং এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, তিনি ছিলেন নিরক্ষর। আর আমরা কথা বলছি বারো শ বছর (মূলত বর্তমান সময় থেকে চৌদ্দ শ বছর) আগের কথা। চৌদ্দটি শতাব্দী পেরিয়ে গেছে। আমরা এমন একজন নিরক্ষর লোকের সামনে রয়েছি যিনি গভীর ও বিস্তারিত জ্ঞানসমৃদ্ধ এমন সব কথা বলছেন যা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। তা আসলেই বিস্ময়ের ব্যাপার। আমি ব্যক্তিগতভাবে এটাকে আকস্মিকতা বলে মেনে নিতে পারি না। কেমন করে করে আকস্মিকতা হতে পারে? ওখানে (কুরআনে) প্রচুর বিষয় আছে যা বিজ্ঞানের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি ড. মুরের মতই বলি যে, আমার এগুলোকে সত্য বলে মেনে নিতে দ্বিধা নেই যে, এগুলো স্রষ্টার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনিই এ বিষয়গুলোকে জানিয়ে দিয়েছেন।"

ড. পারসাউড তার লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে কুরআনের বেশ কিছু আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন কনফারেন্সেও তা উল্লেখ করেছেন।

2) ড. জো লেই সিম্পসন: তিনি আমেরিকার বায়লোর বিশ্ববিদ্যালয়, হোস্টন, টেক্সাস এর মেডিক্যাল বিভাগের অধীনে প্রসূতি, মহিলা রোগ ও জীনতত্ত্ব বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান এবং টেনিসি বিশ্ববিদ্যালয়, মেমফিস, টেনিসি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রসূতি ও মহিলা রোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এছাড়া তিনি "আমেরিকান ফার্টিলিটি সোসাইটি" র প্রধান ছিলেন। ড. জো লেই সিম্পসন অনেকগুলো পুরস্কার অর্জন করেছেন তন্মধ্যে ১৯৯২ সালে "প্রসূতি ও মহিলা রোগ বিশেষজ্ঞ শিক্ষক সংস্থা" কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার উল্লেখযোগ্য। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'টি হাদীসের উপর গবেষণা চালিয়েছেন। হাদীস দুটি হল:—

ক. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا »

অর্থাৎ “তোমাদের প্রত্যেককে তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন রেখে দেয়া হয়।”[33]

খ. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا »

অর্থাৎ “যখন বীর্যের বয়স ৪২ রাত অতিবাহিত হয় আল্লাহ তা‘আলা তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। তিনি তার আকৃতি, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চামড়া, গোশত ও হাড্ডি তৈরি করে দেন।”[34]

তার গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, মাতৃগর্ভের প্রথম ৪০ দিনে ভ্রূণ একটি বিশেষ সময় অতিক্রম করে। তিনি এ হাদীস দুটির সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। তিনি একটি কনফারেন্সে এ হাদীস উল্লেখ করে বলেন: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিস দু‘টি আমাকে ভ্রূণের প্রথম চল্লিশ দিনের সময়সূচি জানতে সাহায্য করেছে। আজকে সকালে একই কথা উচ্চারণ করেছেন আমাদের আরও দু‘জন বক্তা। এটা যখন লেখা হয়েছে তখন তা বিজ্ঞানের গবেষণার ভিত্তিতেই লেখা হয়েছে– এটা ধারণা করা অমূলক। ... কারণ, জীনতত্ত্ব ও ধর্মের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এ ছাড়াও ধর্ম-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম। কুরআন শরীফে বহু তথ্য আছে সেগুলো বিগত কয়েক শতাব্দী যাবত ঘোষণা ও প্রমাণ করে আসছে যে, কুরআন শরীফ আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ।”

3) ড. ই. মার্শাল জনসন: তিনি দীর্ঘ ২২ বছর যাবত আমেরিকার থমাস জেফার্সন বিশ্ববিদ্যালয়, ফিলাডেলফিয়া, পেনসিলভানিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এর এনাটমি (শারীরবিদ্যা) ও উচ্চতর বায়োলজি (জীববিজ্ঞান) বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন

---

[33] হাদীসটি *সহীহ বুখারী*, #৩২০৮ এবং *সহীহ মুসলিম*, #২৬৪৩ এ বর্ণিত।

বি.দ্র.: পাদটীকায় ব্যবহৃত ‘#’ চিহ্নটি *হাদীস* এর নাম্বারকে চিহ্নিত করে। *হাদীস* হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন করেছেন, তাঁর সঙ্গী-সাহাবীগণ কর্তৃক তার একটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা।

[34] *সহীহ মুসলিম*, #২৬৪৫ এ বর্ণিত।

করেছেন। এছাড়া তিনি Daniel Baugh institute এবং Teratology Society এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ড. জনসনের রয়েছে দুই শতাধিক প্রকাশনা। **১৯৮১** সালে সৌদি আরবের দাম্মামে অনুষ্ঠিত মেডিক্যাল কনফারেন্স চলাকালীন সময়ে ডক্টর জনসন তার গবেষণা জমা-দানের সময় বলেছিলেন: "সংক্ষেপে আল-কুরআন ভ্রূণের শুধু বাহ্যিক দিকের উপরেই আলোচনা করে নি, বরং আভ্যন্তরীণ স্তরগুলো নিয়েও আলোচনা করেছে। আভ্যন্তরীণ যে স্তরসমূহ বর্ণনা করেছে তন্মধ্যে তার সৃষ্টি প্রক্রিয়া, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া উল্লেখযোগ্য মৌলিক বিষয় যা আধুনিককালের বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন: "আমি নিজে বিজ্ঞানী হওয়ার কারণে আমি আমার সামনের বিষয়গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারি। ফলে, ভ্রূণ-বিজ্ঞান, উচ্চতর জীববিজ্ঞান ও কুরআন থেকে অনুদিত শব্দগুলোর অর্থ বুঝার চেষ্টা করতে পারি। আমি আগেই উদাহরণ দিয়েছি যদি আমার পক্ষে সম্ভব হত আমি বর্তমানে যা জানি ততটুকু জ্ঞান নিয়ে আগেকার ওই যুগে যেতে পারতাম (আমি হতাম সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি) এবং আমার যোগ্যতা থাকত কোনকিছুকে ভালভাবে উপস্থাপনা করার, তবুও আমি কুরআন যেভাবে বর্ণনা করেছে তদ্রূপ কোন বিষয়ের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে অপারগ হতাম। আমি এ চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করার কোন যুক্তি খুঁজে পাই না যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেকোনো স্থান থেকে এ তথ্যগুলো পেয়েছেন। সেজন্য মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা লিখতে পেরেছেন[35] তাতে স্রষ্টার কারসাজি আছে এ ধারণাতে আমি কোন বৈপরীত্য দেখি না।"

4) ডক্টর উইলিয়াম ডব্লিউ হে : তিনি একজন বিখ্যাত সমুদ্র-বিজ্ঞানী এবং কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়, বোল্ডার, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র -এর ভূ-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। এর আগে তিনি মেরিনের রজেন্টিয়াল স্কুলের ডিন এবং মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়, মায়ামি, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র -এর বায়ুমণ্ডল বিজ্ঞান বিভাগের ডীন ছিলেন। সমুদ্র-সংক্রান্ত কুরআনে উল্লেখিত বিষয়ের যেগুলো আধুনিক বিজ্ঞান কর্তৃক সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করার পর তিনি বলেন: "এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, এ ধরনের বিষয় প্রাচীন গ্রন্থ কুরআন শরীফে রয়েছে। অথচ, ইতোপূর্বে এর উৎস সম্বন্ধে

---

[35] মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নিরক্ষর। তিনি লেখা বা পড়া কিছুই জানতেন না। বরং, সাহাবীদের দিয়ে তা লেখাতেন এবং তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করতেন।

আমার জানার সুযোগ হয় নি। আরও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কথা হল এই তথ্যগুলো এখানে আছে। আর এ গবেষণা এবং আবিষ্কারও তার কিছু বাক্যের মর্মার্থ জানার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।" ড. উইলিয়াম হে কে প্রশ্ন করা হল— কুরআনের উৎস তাহলে কি হতে পারে? তিনি বলেন: "আচ্ছা; আমি মনে করি অবশ্যই তা স্রষ্টার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ।"

5) ড. জেরাল্ড সি. জিওরিঙ্গার: তিনি একজন বক্তা ও জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াশিংটন, আমেরিকা এর মেডিক্যাল অনুষদের অধীনে সেল বায়োলজি বিভাগের ভ্রূণ-চিকিৎসাবিদ্যার সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন। সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত অষ্টম মেডিক্যাল কনফারেন্সে গবেষণা পেপার জমাদানকালে তিনি বলেছিলেন: "কুরআনের কিছু আয়াত ব্যাপকভাবে বীর্যের সংমিশ্রণকাল থেকে শুরু করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত মানব ভ্রূণের সমস্ত ব্যাপারে আলোচনা করেছে। এর আগে গ্রন্থ, পরিভাষা ও গুণাবলির দিক থেকে মানব ভ্রূণের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে এত স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আর কোথাও পাওয়া যায় নি। তবে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের সন্তান ও ভ্রূণ বৃদ্ধির স্তরসমূহ বিভিন্ন পুরাতন তাত্ত্বিক গ্রন্থে বেশ কয়েক শতাব্দী আগেই যা লিখিত ছিল— তারও অগ্রগামী হয়েছে।"

6) ড. ইয়োশিহাইড কোযাই: তিনি জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়, হঙ্গো, টোকিও এর অধ্যাপক এবং জাতীয় মহাকাশ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, মিটাকা, টোকিও, জাপান -এর প্রধান ছিলেন। তিনি বলেন: "আমার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় ছিল— আমি মহাকাশের বিভিন্ন প্রমাণিত সত্য তথ্যাদি কুরআন শরীফে পেয়েছি। আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর খুব কম বিষয়ই আবিষ্কার করতে পেরেছে। আমরা আমাদের পরিকল্পনা ও অক্লান্ত চেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর খুব কমই জানতে পেরেছি। কারণ, আমরা টেলিস্কোপ ও আধুনিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করে পুরো সৌরজগতের ব্যাপারে চিন্তা করা তো দুরের কথা এর অত্যন্ত সামান্য অংশ দেখতে পাই। কুরআন অধ্যয়ন ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার পর আমি আগামীতে বিশ্বজগত নিয়ে গবেষণার নতুন পথের সন্ধান পেয়ে যাব।"

7) প্রফেসর টেজাটাট টেজাসেন: তিনি থাইল্যান্ডের শিয়াংমাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যা বিভাগের প্রধান। পূর্বে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল বিভাগের ডিন

হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত অষ্টম মেডিক্যাল কনফারেন্স চলাকালে তিনি দাঁড়িয়ে বলেন: "গত তিন বছর যাবত আমি কুরআন শরীফকে গুরুত্ব দিতে লাগলাম। আমার গবেষণা এবং এই কনফারেন্স থেকে যা শিখলাম তার ফলে আমার মনে এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, সমস্ত বিষয়ই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আজ থেকে চৌদ্দ শ বছর আগেই উল্লেখিত হয়েছে এবং এর সব বিষয় বিজ্ঞান দ্বারা সত্য প্রমাণ করা সম্ভব। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে বা লিখতে জানতেন না। অবশ্যই তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত দূত। এগুলো অন্ধকারে আলোর দিশা হিসেবে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকেই তার উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর নিশ্চিতভাবেই সেই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অতএব, আমাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে "لا إله إلا الله محمد رسول الله" অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া আর কোন সঠিক ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল"— এ কথা বলার। সর্বশেষে সুন্দর এ কনফারেন্সের আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমি শুধুমাত্র দ্বীনী ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই যে উপকার পেয়েছি তা নয়, বরং আমার সৌভাগ্য হয়েছে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীদের সাথে সাক্ষাত করার। কনফারেন্সে যোগদানকারীদের মধ্য থেকে অনেক নতুন নতুন লোককে বন্ধু হিসেবে পেয়েছি। তবে, এখানে এসে সবচাইতে বড় যে জিনিসটা আমি লাভ করতে পেরেছি তা হল— "لا إله إلا الله محمد رسول الله" (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)। এটা পড়ে আমি মুসলিম হয়ে গেলাম।"

কুরআন শরীফে বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্যগুলো বর্তমান থাকার উদাহরণ এবং এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের বক্তব্য উল্লেখ করার পর আমরা নিজেদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন করব; প্রশ্ন গুলো হল—

- আধুনিক বিজ্ঞান কর্তৃক প্রমাণিত যেসব তথ্য চৌদ্দ শ বছর আগে কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে তা কি আসলে অপ্রত্যাশিতভাবে মিলে গেছে?
- এটা কি সম্ভব যে এই কুরআন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বা অন্য কোনো ব্যক্তি লিখেছেন?

একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর হল— মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার আক্ষরিক বাণী। এটি মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে।

(আরও বিস্তারিত জানতে www.islam-guide.com/science ব্রাউজ করতে পারেন।)

২. একটি সুরা এনে দিতে চ্যালেঞ্জ:

আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٣) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢٤) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

অর্থাৎ "আমি আমার বান্দার (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের) প্রতি যা নাজিল করেছি তাতে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তাহলে, এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব সাহায্যকারীদের সঙ্গে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি না পার; অবশ্য তা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর যার জ্বালানী হবে মানুষ আর পাথর, সেটা প্রস্তুত রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য। আর হে নবী! সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম , যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে আপনি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবহমান থাকবে..." (সূরা আল-বাকারা: ২৩-২৫)

কুরআন নাযিলের পর থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে; কিন্তু কেউ কুরআনের সূরার মত সৌন্দর্য, ভাষার অলংকার ও অন্যান্য গুণাবলি-সমৃদ্ধ একটি সূরা নিয়ে আসতে সক্ষম হয় নি।

উদাহরণস্বরূপ, কুরআন শরীফের ছোট্ট সুরা "আল কাউসার" (সুরা নং-১০৮) এর শব্দ সংখ্যা মাত্র ১০। এতদসত্ত্বেও অতীত ও বর্তমান কালের কেউ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসে নি।[36]

---

[36] *আল-বুরহান ফি উলুমিল কুরআন*, আয-যারকাশী, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-২২৪ দ্রষ্টব্য।

কুরআন মাজীদের সবচেয়ে ছোট্ট সূরা "আল-কাউসার" (সূরা নং-১০৮), পবিত্র কুরআনের এই সূরার মতোও একটি সূরা কেউ এখনো রচনা করতে পারে নি।

কিছু মুশরিক (পৌত্তলিক) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতাবশত এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী নন তা প্রমাণ করা। কিন্তু, তাদের নিজেদের ভাষায় কুরআন মাজীদ নাজিল হওয়া সত্ত্বেও তারা তাতে ব্যর্থ হয়। অথচ, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কার আরবরা আরবি ভাষা ও তার অলঙ্কার শাস্ত্রে খুবই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিল। তারা কবিতা রচনা করত তাতে ব্যবহার করত অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের ভাষালংকার। এখনও লোকেরা তাদের সেই কবিতা আবৃত্তি করে রীতিমত আশ্চর্য হয়।

৩. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী:

বাইবেলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী ইসলামের সত্যতারই একটা প্রমাণ। এ ছাড়া সেটা বাইবেলে বিশ্বাসী মানুষদের চোখের সামনেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের একটা প্রমাণ।

Deutaronomy (দ্বিতীয় বিবরণ) এর ১৮ তে বলা হয়েছে, মুসা আ. বলেন: আল্লাহ তা'আলা আমাকে বললেন: **"তাদের জন্য তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত একজন নবীকে প্রেরণ করা হবে। আমি তার মুখে আমার কথা দিয়ে দেব। তিনি আমার নির্দেশিত বাণী দিয়ে কথাবার্তা বলবেন। আর যারা তার**

মুখস্থিত আমার কথা না শুনবে তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করব।" (দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ : ১৮-১৯)

উক্ত উক্তির সারাংশ হলো— আবির্ভূত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

১. তিনি হবেন মুসা আ. এর মত।

২. তিনি ইসরাইলীদের ভাইদের তথা ইসমাইলিয় বংশ থেকে আসবেন।

৩. আল্লাহ তা'আলা নিজ বাণীকে তার মুখে দিয়ে দিবেন। তিনি তার নির্দেশিত বিষয়সমূহ মানুষকে জানিয়ে দিবেন।

এবার আসুন! আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও চিন্তা করি।

১. মুসা আ. এর মত নবী:

মুসা আ. ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যকার যেমন মিল রয়েছে অন্যান্য নবীদের মধ্যে সে রকম মিল অন্য দু'জন নবীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর। তারা উভয়েই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন। তারা প্রত্যেকেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে আশ্চর্যজনকভাবে বিজয়ী হয়েছেন। তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন নবী ও রাষ্ট্রপ্রধান। এবং তারা প্রত্যেকেই নিজের মাতৃভূমি থেকে তাদের বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্রের কারণে হিজরত (যাত্রা) করেছেন।

ঈসা আ. ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে উপরের মত মিল নেই এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও মিল নেই যেমন— স্বাভাবিক জন্ম, পারিবারিক জীবন এবং মুসা আ. ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত স্বাভাবিক মৃত্যু; যেহেতু ঈসা আ. ইন্তেকালই করেন নি।

মুসা আ. ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকের উম্মতেরা তাদেরকে যেমন আল্লাহ তা'আলার নবী মনে করেন; ঈসা আ. এর অনুসারীরা তাকে তেমন নবী মনে করে না বরং আল্লাহ তা'আলার পুত্র মনে করে। এ ছাড়া মুসলিমরা ঈসা আ. কেও আল্লাহ তা'আলার নবী বলে বিশ্বাস করে।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে, বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলে যায়; ঈসা আ. এর সাথে নয়। কারণ, মুসা আ. এর সাথে ঈসা আ. এর তুলনায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদৃশ্যই বেশি।

অপরদিকে, "গসপেল অব জন" থেকে জানা যায় যে, ইহুদিরা তিনটি স্বতন্ত্র ভবিষ্যদ্বাণীর অপেক্ষা করছিল। সেগুলো হল-

১. ঈসা আ. এর আবির্ভাব

২. ইলিয়ার (Elija) আবির্ভাব।

৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব।

জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট (ইয়াহিয়া আ.) -কে জিজ্ঞাসা করা তিনটি প্রশ্ন থেকেই এটা স্পষ্ট হয় যে, তারা তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীর অপেক্ষা করছিল: "**এই হলো জনের সাক্ষ্য, যখন জেরুজালেমের ইহুদিরা পাদ্রীদেরকে পাঠাল এই প্রশ্ন করতে যে, 'কে আপনি?' তিনি নিজের পরিচয় দিলেন, অস্বীকার করেন নি। তিনি তাদেরকে বললেন: 'আমি খ্রিষ্ট নই'। তারা জিজ্ঞাসা করল: 'তাহলে আপনি কি ইলিয়'? উত্তরে বললেন: 'না।' তারা বলল: 'আপনি কি সেই নবী'? তিনি বললেন: 'না'।**" (জন ১: ১৯-২১)

যদি আমরা বাইবেলের পাতার পার্শ্ব-টীকার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, সেখানে (জন ১:২১) উল্লেখিত "Prophet" শব্দটি Deutaronomy (দ্বিতীয় বাণী) এর ১৮ : ১৫ এবং ১৮ : ১৮ তে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পৃক্ত। উক্ত আলোচনার পর এখন আমরা বলতে পারি যে, Deutaronomy (দ্বিতীয় বাণী) এর ১৮ : ১৮ তে উল্লেখিত নবী বলে ঈসা আ. কে বুঝানো হয় নি।

২. ইসরাইলীদের ভ্রাতৃবর্গ থেকে:

ইব্রাহীম আ. এর ছিল দুই সন্তান; ইসমাইল ও ইসহাক আ. (Genesis বা আদিপুস্তক ২১)। ইসমাইল আ. হলেন আরবদের পূর্বপুরুষ। আর ইসহাক আ. ইহুদি জাতির পূর্বপুরুষ। আর যে নবীর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তিনি ইহুদীদের মধ্য থেকে আসবেন না। বরং তিনি আসবেন তাদের ভ্রাতৃবর্গদের মধ্য থেকে, তথা ইসমাইল আ. এর বংশ থেকে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইসমাইল আ. এর বংশ থেকে এসেছেন। সুতরাং, তিনিই বাইবেলে উল্লিখিত আকাঙ্ক্ষিত নবী।

বাইবেলের ইশাঈয়া ৪২ : ১-১৩ তে আলোচনা করা হয়েছে একজন আল্লাহর বান্দা "যাকে নির্বাচন করা হয়েছে" এবং "রাসূল (দূত)" সম্পর্কে। বলা হয়েছে যে, তিনি শরীয়ত তথা জীবনবিধান নিয়ে আসবেন। "**তিনি তা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত বা পিছপা হবেন না। দ্বীপের অধিবাসীরা তার আনিত জীবনবিধানের জন্য অপেক্ষায় থাকবেন।**" (ইশাঈয়া ৪২ : ৪) ১১ নং উক্তিতে রাসূল বা দূতকে "কেদারের" বংশ থেকে আবির্ভাব হবে বলে বলা হয়েছে। Genesis (আদিপুস্তক) ২৫:১৩ অনুসারে

কেদার হলেন— ইসমাইল আ. এর দ্বিতীয় পুত্র ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বপুরুষ।

৩. আল্লাহ এই নবীর মুখে তার বাণী রাখবেন:

আল্লাহ তা‘আলা তার বাণী কুরআন মাজীদকে বাস্তবিকই তার মুখে দিয়ে দিয়েছেন। তিনি জিবরাইল আ. কে পাঠিয়েছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার বাণী শিক্ষা দেবার জন্য। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের দিয়ে জিবরাইল আ. এর কাছ থেকে যেমন শুনতেন তেমনি লিখিয়ে নিতেন। সুতরাং, কুরআনের বাণী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা নয়। তার নিজের চিন্তা-প্রসূত নয়। বরং, তা জিবরাইল আ. এর মাধ্যমে তার মুখে রাখা হয়েছে। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই এবং তার নিজের পরিচালনাতেই সাহাবীরা কুরআনকে লিপিবদ্ধ ও কণ্ঠস্থ করেছেন।

লক্ষ করুন, Deutaronomy (দ্বিতীয় বর্ণনা) -এ বলা হয়েছে, “আর যারা তার মুখস্থিত আমার কথা না শুনবে আমি তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করব।” (দ্বিতীয় বর্ণনা ১৮:১৯) এর অর্থ হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি বাইবেলে বিশ্বাস করবে, তাকে অবশ্যই এই নবীর কথা বিশ্বাস করতে হবে। আর এ নবী হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

(বাইবেলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে আরও জানতে www.islam-guide.com/mib ব্রাউজ করতে পারেন)

৪. কুরআনের উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী, যা পরবর্তীতে বাস্তবে ঘটেছে

কুরআনে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীসমুহের মধ্যে যা পরবর্তীতে হুবহু ঘটেছে তন্মধ্যে একটি হল, পারস্যদের কাছে পরাজয়ের পর ৩ থেকে ৯ বছরের মধ্যে পারস্যদের উপর রোমানদের বিজয়। আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মাজীদে বলেন:

﴿غُلِبَتِ ٱلرُّومُ (٢) فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ (٣) فِي بِضۡعِ سِنِينَ﴾

অর্থাৎ “রোমকরা পরাজিত হয়েছে (আরব উপদ্বীপের) নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিশীঘ্রই বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যে।” (আল-কুরআন, সূরা আর-রুম: ২-৪)

আসুন! আমরা এই যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে একটু আলোচনা করি। *History of The Byzantine State* গ্রন্থে লেখক বলেন: **৬১৩** খৃষ্টাব্দে রোমান বাহিনী এন্টিয়ক (Antioch) -এ অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে, পারস্য সাম্রাজ্য চারদিকে

তাদের দখল পাকাপোক্ত করে নেয়।[37] ঐ সময় কোন লোকের পক্ষে এটা ধারণা করা রীতিমত অসম্ভব ছিল যে, রোম সাম্রাজ্য আবার পারস্যের উপর বিজয়ী হবে। তবে, কুরআন মাজীদ ভবিষ্যদ্বাণী করল যে, আগামী ৩ থেকে ৯ বছরের মধ্যে রোমানরা পারস্যের উপর বিজয়ী হবে। পরাজয়ের ৯ বছর পর, বাস্তবিকই, **৬২২** খৃষ্টাব্দে রোমানরা পারস্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল আরমেনিয়ার ভূমিতে। যুদ্ধের ফলাফল স্বরূপ রোমানরা ৬১৩ খৃষ্টাব্দে পরাজয়ের পর পারস্যের উপর প্রথম বারের মত সুবিশাল বিজয় অর্জন করল।[38] এভাবেই কুরআন মাজীদের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হল।

এছাড়াও কুরআন শরীফে আরও অনেক আয়াত আছে ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশ কিছু হাদীসেও কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যা পরবর্তীতে সংঘটিত হয়েছে। এগুলো সম্বন্ধে জানতে "কনভেইং ইসলামিক মেসেজ সোসাইটি" কর্তৃক প্রকাশিত "আল-মু'জিযাতুল খালিদাহ" বা চিরন্তন মু'জিযাহ বইটি দেখা যেতে পারে।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু মু'জিযা (মিরাকল)

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বেশকিছু মু'জিযা বা অলৌকিক কাজ সংঘটিত হয়েছে। বহু মানুষ সেগুলোকে স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ কিছু মু'জিযা নিম্নে বর্ণিত হল—

- যখন মক্কার মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মু'জিযা দেখাতে আবদার করল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন।[39]
- আরেকটি মু'জিযা হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের আঙ্গুল থেকে পানির ধারা বয়ে যাওয়া। জাবের ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'একদিন আসর সালাতের সময় আমি নিজেকে রাসূল

---

[37] *History of the Byzantine State*, Ostrogorsky, p. 95.

[38] *History of the Byzantine State*, Ostrogorsky, pp. 100-101, এবং *History of Persia*, Sykes, vol. 1, pp. 483-484. আরও দেখুন, *The New Encyclopaedia Britannica*, Micropaedia vol. 4, p. 1036.

[39] *সহীহ বুখারী*, #৩৬৩৭ এবং *সহীহ মুসলিম*, #২৮০২ -এ বর্ণিত।

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখলাম (রাসূল সা. এর সাথে ছিলাম)। অথচ, আমাদের সাথে পাত্রের মধ্যে খুবই সামান্য পানি ছাড়া আর কোন পানি ছিল না। পানিটুকুকে একটি পাত্রে রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পানিতে তার হাত ঢুকিয়ে আঙ্গুলসমূহ ছড়িয়ে দিলেন। তারপর বললেন: "হে অযুকারীরা (অযু করতে ইচ্ছুক)! আমার দিকে এস। (এটি) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বরকত"। আমি দেখলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙ্গুলসমূহের মাঝখান থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সাহাবীরা সবাই অযু করলেন এবং পান করলেন। আমি সেটাকে বরকত মনে করে তার থেকে মুখ ফিরালাম না যতক্ষণ না আমার পেট পূর্ণ হয়।' জাবের রা. -কে জিজ্ঞাসা করা হল আপনারা ঐ দিন কত লোক ছিলেন? তিনি বললেন: 'এক হাজার চার শ জন।' হুসাইন ও আমর ইবনে মুররা সালেম থেকে জাবের রা. সূত্রে বলেন: 'এক হাজার পাঁচ শ জন।'[40]

এ ছাড়া আরও অনেক মু'জিযা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে সংঘটিত হয়েছে। সেগুলোর কিছু জানার জন্য "কনভেইং ইসলামিক মেসেজ সোসাইটি" কর্তৃক প্রকাশিত "আল-মু'জিযাতুল খালিদাহ" বা চিরন্তন মু'জিযাহ বইটি দেখা যেতে পারে।

৬. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনাড়ম্বর জীবনযাপন

আমরা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত পূর্ববর্তী জীবনের সাথে নবুওয়াত পরবর্তী জীবনের তুলনা করি তাহলে দেখতে পাব যে, তিনি সম্মান, মর্যাদা, নেতৃত্ব বা অন্য কোনো কিছু পাওয়ার লোভে নিজেকে নবী বলে দাবি করেছেন— এ কথা সুস্থ বিবেকও মেনে নেবে না।

নবুওয়াত পাওয়ার আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন দুশ্চিন্তা বা সমস্যা ছিল না। তিনি সৎ, প্রসিদ্ধ ও সফল ব্যবসায়ী হিসেবে সন্তোষজনক আয় করতেন। কিন্তু, নবুওয়াত লাভের পর তা সাধারণ পর্যায়ের চেয়ে আরও নিচে নেমে পড়ল। বিষয়টা পরিষ্কার করতে আমরা তাঁর জীবনের কয়েকটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরব।

- একটি হাদীসে এসেছে:—

---

[40] *সহীহ বুখারী*, #৩৫৭৬ এবং *সহীহ মুসলিম*, #১৮৫৬ -এ বর্ণিত।

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنَ أُخْتِي: إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ فَقُلْتُ يَا خَالَةُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا

অর্থাৎ ওরওয়া ইবনে যুবাইর রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রা. হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আয়েশা রা.) তাকে বলেছেন: হে আমার ভাগিনা (বোনের ছেলে)! আমরা নতুন চাঁদ দেখতাম, তারপর আবার চাঁদ দেখতাম, এভাবে দুইমাসে তিনবার নতুন চাঁদ দেখতাম; অথচ, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়ির চুলায় আগুন জ্বলে নি। আমি বললাম: খালা! তাহলে আপনারা কিভাবে জীবন ধারণ করতেন? তিনি বললেন: দুইটি কালো দ্রব্য— পানি ও খেজুর দিয়ে। তবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু প্রতিবেশীর দুগ্ধবতী ছাগল বা উট ছিল, তারা তার দুধ দোহন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহার দিতেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে আমাদেরকে পান করাতেন।[41]

- অন্য হাদীসে এসেছে—

قَالَ أَنَس بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه- فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ

অর্থাৎ আনাস রা. বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত কোনো মোলায়েম রুটি দেখেছেন বলে আমার জানা নাই।[42]

- অপর হাদীসে এসেছে—

قَالَتْ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها كَانَ فراش رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَما و حَشْوُهُ لِيفٍ

অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রা. বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা ছিল খেজুর-গাছের বাকল-ভর্তি চামড়া দ্বারা তৈরি।[43]

- আরেক হাদীসে এসেছে—

---

[41] *সহীহ বুখারী*, #২৫৬৭ এবং *সহীহ মুসলিম*, #২৯৭২ -এ বর্ণিত।

[42] *সহীহ বুখারী*, #৫৪১৩ এবং *তিরমিযী*, #২৩৬৪ -এ বর্ণিত।

[43] *সহীহ বুখারী*, #৬৪৫৬ এবং *সহীহ মুসলিম*, #২০৮২ -এ বর্ণিত।

عن عمرو بن الحرث قال : ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله

অর্থাৎ আমর ইবনে হারেস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর সময়ে কোনো দীনার, দিরহাম, দাস, দাসী— কিছুই রেখে যান নি, শুধুমাত্র সাদা খচ্চর (যাতে তিনি আরোহণ করতেন), তরবারি ও এক টুকরা জমিন ছাড়া, যা তিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছেন।[44]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম কঠোরভাবে জীবন যাপন করেছেন, যদিও বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রের কোষাগার তার হাতে ছিল। আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ লোক তার মৃত্যুর আগেই ইসলামে প্রবেশ করেছিল এবং তার নবুওয়াত প্রাপ্তির ১৮ বছর পর মুসলিমগণ বিজয় লাভ করেছেন।

তাহলে, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত দাবি করেছেন উচ্চাভিলাসিতা ও নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য'— এটা বলা কি সম্ভব? অথচ, নেতৃত্ব ও উচ্চাভিলাসিতার সাথে স্বাভাবিকভাবেই ভাল ভাল খাবার-দাবার, উন্নত পোশাক ও সুউচ্চ অট্টালিকা ও পাহারাদার বর্তমান থাকার কথা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এগুলোর কোনটিই বা ছিল? এর উত্তরে আসুন, আমরা তার জীবনের সুন্দর একটা চিত্রে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিই।

আল্লাহর নবী, শিক্ষক, রাষ্ট্রনায়ক ও বিচারক হওয়া সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর দুধ দোহন করতেন।[45] নিজের পোশাক নিজেই সেলাই করতেন, নিজের জুতা নিজে মেরামত করতেন।[46] বাড়ির গৃহস্থালি কাজে সহযোগিতা করতেন।[47] গরিব-অসুস্থদেরকে সেবা-শুশ্রূষা করতেন।[48] এ ছাড়া তার সাহাবীদেরকে বালি সরিয়ে খন্দক বা খাল খননে সহযোগিতা করতেন।[49] মোটকথা, তার জীবনটা ছিল বিনয় ও নম্রতার একটা উজ্জ্বল আদর্শ।

---

[44] *সহীহ বুখারী*, #২৭৩৯ এবং *মুসনাদ আহমাদ*, #১৭৯৯০ -এ বর্ণিত।

[45] *মুসনাদ আহমাদ*, #২৫৬৬২ -এ বর্ণিত।

[46] *সহীহ বুখারী*, #৬৭৬ এবং *মুসনাদ আহমাদ*, #২৫৫১৭ -এ বর্ণিত।

[47] *সহীহ বুখারী*, #৬৭৬ এবং *মুসনাদ আহমাদ*, #২৩৭০৬ -এ বর্ণিত।

[48] *মুয়াত্তা মালেক*, #৫৩১ -এ বর্ণিত।

[49] *সহীহ বুখারী*, #৩০৩৪; *সহীহ মুসলিম*, #১৮০৩ এবং *মুসনাদ আহমাদ*, #১৮০১৭ -এ বর্ণিত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবীগণ অত্যন্ত ভালবাসতেন, সম্মান করতেন এবং তার উপর এত আস্থা পোষণ করতেন যে, রীতিমত আশ্চর্য হতে হয়। কিন্তু তিনি সর্বদা গুরুত্বারোপ করে বলতেন যে, ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র হকদার আল্লাহ তা‘আলা; তিনি নন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী (সঙ্গী) আনাস রা. বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অন্য কাউকে বেশি ভালবাসতেন না। এতদসত্ত্বেও তিনি যখন তাদের কাছে আসতেন তখন তারা দাঁড়াতেন না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য কেউ দণ্ডায়মান হোক তা অপছন্দ করতেন[50], যেমনটি অন্যান্য জাতির লোকেরা বড় ধরণের লোকের জন্য করে থাকে।

ইসলামের উজ্জ্বল জ্যোতি পুরোপুরি প্রকাশিত হওয়া এবং তার উপর সীমাহীন অত্যাচার নির্যাতনের আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের কাছে কাফেরদের পক্ষ থেকে “উতবা” নামক একজন প্রতিনিধি এসে তাকে বলল: “...যদি আপনি সম্পদ চান তাহলে, আমরা আমাদের সম্পদ সম্পত্তি জমা করে আপনাকে দিয়ে দেব; ফলে আপনি আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে ধনী হয়ে যাবেন। যদি আপনি সম্মান কামনা করেন, তাহলে আমরা আপনাকে আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে দেব; আপনার নির্দেশ ব্যতীত আমরা কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব না। আর যদি রাজত্ব চান তাহলে, আমাদের উপর আপনাকে বাদশাহ বানিয়ে দেব। ...” এতগুলো বিষয়ের বিনিময়ে তার কাছে করা হয়েছে একটিমাত্র দাবি। আর তাহলো— মানুষকে ইসলাম ও অংশীদারবিহীন একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের দাওয়াত দেয়া থেকে ক্ষান্ত হওয়া। যারা দুনিয়ার ভোগ বিলাসে থাকে লালায়িত তাদের জন্য কি এটা মোক্ষম সুযোগ ছিল না? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মুশরিকদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য টালবাহানা করেছিলেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এর চেয়ে আরও বেশি লাভ পাওয়ার জন্য কৌশলে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন?

---

[50] *মুসনাদ আহমাদ,* #১২১১৭ এবং *তিরমিযী,* #২৭৫৪ -এ বর্ণিত।

কক্ষনো নয়। বরং, তার জবাব ছিল— "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" অতঃপর উত্‌বার সামনে কুরআনের সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ'র প্রথম চার আয়াত তেলাওয়াত করলেন...[51] আল্লাহ বলেন:

﴿حم (١) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٤)﴾

অর্থাৎ "হা-মীম। এটা অবতীর্ণ হয়েছে পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ আরবি কোরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। এটা নাযিল হয়েছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শোনে না।" (সূরা হা-মীম আসসাজদাহ: ১-৪)

অন্যস্থানে তার নিজ চাচার আবেদনে তিনি বলেছিলেন: "চাচা! আল্লাহর কসম! তারা যদি আমার ডানহাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্রও এনে দেয় তবুও আমি এ কাজ (মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া) থেকে বিরত হব না যতক্ষণ না আল্লাহ একে বিজয়ী করে অন্যগুলোকে মূলোৎপাটিত করে দেন।"[52]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের উপর সুদীর্ঘ ১৩ বছর ধরে অত্যাচার নির্যাতন করেই তারা ক্ষান্ত হয় নি, বরং তারা বেশ কয়েকবার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। একবার তারা তাকে উপর থেকে একটি বিশালাকার পাথর নিক্ষেপে হত্যার চেষ্টা করেছে। যাতে তা তার মাথার উপর পড়ে তাকে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় করে দেয়। আরেকবার তাকে হত্যা করার মানসে দাওয়াত দিয়ে তার খাদ্যে বিষ মিশিয়ে তাকে খেতে দেয়া হয়।[53]

শত্রুদের উপর চূড়ান্ত বিজয় লাভের পরও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের উপর এত অত্যাচার-নির্যাতন ও ত্যাগ-তিতিক্ষা থাকা কি প্রমাণ করে?তার সুউচ্চ সম্মান ও বিজয়লাভের সময়কার বিনয় ও মহত্ত্বের ব্যাখ্যা কিভাবে বর্ণনা করা সম্ভব? তার সফলতা অর্জিত হত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে;তার নিজস্ব আভিজাত্যের কারণে নয়। এমন বৈশিষ্ট্য কি এমন লোকের ভিতর থাকা সম্ভব যে পদলোভী ও স্বার্থপর?!

---

[51] *সীরাতে ইবনে হিশাম,* খণ্ড ১, পৃ. ২৯৩-২৯৪।

[52] *সীরাতে ইবনে হিশাম,* খণ্ড ১, পৃ. ২৬৫-২৬৬।

[53] *সীরাতে ইবনে হিশাম,* খণ্ড ১, পৃ. ২৯৮-২৯৯।

৭. ইসলামের বিস্ময়কর বিস্তৃতিলাভ

এ অধ্যায়ের শেষে এমন কিছু বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করাও যুক্তিযুক্ত যা ইসলামের সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এ কথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, আমেরিকাসহ সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারিত ধর্মের নাম ইসলাম। এই আশ্চর্যজনক সংবাদের সামান্য জরীপ নিম্নে বর্ণিত হল।

- "ইসলাম আমেরিকায় খুব দ্রুত সম্প্রসারণকারী ধর্ম। সেটা আমাদের দেশের অনেক লোকের পথনির্দেশক ও স্থিতিশীলতার চাবিকাঠি।..." (হিলারি রোধাম ক্লিনটন, *Los Angeles Times*)[54]
- "মুসলিমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত একটি সম্প্রদায়।..." (পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো, *USA Today*)[55]
- "... এই দেশে ইসলাম অতিদ্রুত সম্প্রসারণকারী ধর্ম।" (জেরাল্ডিন বাউম। Geraldine Baum, *Newsday* Religion writer, *Newsday*)[56]
- "ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত সম্প্রসারণকারী ধর্ম। ..." (অ্যারি এল. গোল্ডম্যান - Ari. L. Goldman, *New York Times*)[57]

এই আশ্চর্যজনক সম্প্রসারণ ইসলামের সত্যতারই প্রমাণ বহন করে। আমেরিকাসহ সারা বিশ্বের অসংখ্য লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে দলে দলে অবস্থান গ্রহণ করছেন। তারা চিন্তা-ভাবনা না করেই ইসলামকে সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দ্বীন বলে মেনে নিচ্ছেন এটা কল্পনাও করা যায় না। এ নও-মুসলিমদের দেশ, পরিবেশ, কৃষ্টি-কালচার ও সামাজিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন। তাদের মধ্যে রয়েছেন—

---

[54] Larry B. Stammer, Times Religion Writer, "First Lady Breaks Ground With Muslims," *Los Angeles Times*, Home Edition, Metro Section, Part B, May 31, 1996, p. 3.

[55] Timothy Kenny, "Elsewhere in the World," *USA Today*, Final Edition, News Section, February 17, 1989, p. 4A.

[56] Geraldine Baum, "For Love of Allah," *Newsday*, Nassau and Suffolk Edition, Part II, March 7, 1989, p. 4.

[57] Ari L. Goldman, "Mainstream Islam Rapidly Embraced By Black Americans," *New York Times*, Late City Final Edition, February 21, 1989, p. 1.

বিজ্ঞানী, শিক্ষক, দার্শনিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অভিনেতা ও খেলোয়াড় প্রভৃতি।

উপরোক্ত প্রমাণাদি এ বিশ্বাসকে পাকাপোক্ত করে যে, কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার বাণী, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্য নবী ও রাসূল এবং ইসলাম আল্লাহ তা'আলার সত্য দ্বীন বা ধর্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম গ্রহণের উপকারিতা

ইসলামে ব্যক্তি ও সমাজের প্রচুর কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলামের খাতিরে ব্যক্তি যে সমস্ত কল্যাণ ও ফায়দা লাভ করে তা এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইত্যাদি।

১. চিরন্তন জান্নাতের পথ:

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

অর্থাৎ "হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে আপনি এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন যার নিচ দিয়ে নদী সমূহ প্রবহমান থাকবে।" (সূরা আল-বাকারা: ২৫)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

অর্থাৎ "তোমরা সামনে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য।" (সূরা আল-হাদীদ: ২১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন:

إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ كَبْوًا فَيَقُولُ اللَّهُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا

অর্থাৎ "আমি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে জানি যে সর্বশেষে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার অনুমতি পাবে এবং সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ঐ ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুখের উপর ভর করা অবস্থায় (উপুড় হয়ে) বের হবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন: যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতের কাছে এসে মনে করবে জান্নাত ভর্তি হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে: হে আল্লাহ!জান্নাতকে দেখলাম ভর্তি হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় বলবেন:যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে আবার জান্নাতের কাছে এসে মনে

করবে যে, জান্নাত ভর্তি হয়ে গেছে। ফিরে এসে পুনরায় বলবে-আল্লাহ! জান্নাতকে দেখলাম ভরপুর হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা এবার বলবেন: যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য সেখানে রয়েছে দুনিয়া ও তার দশগুণ পরিমাণ স্থান।"[58]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় এক সকাল অথবা এক সন্ধ্যা কাটানো দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা হতে উত্তম। আর জান্নাতের মধ্যকার তোমাদের কারো ধনুক বা পা রাখার সমপরিমাণ স্থান দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম।"[59]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

অর্থাৎ "আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন জান্নাতকে প্রস্তুত করে রেখেছি যাকে কোন চোখ দেখেনি। কোন কান (যথার্থ) শোনেনি এবং কোন অন্তর কল্পনাও করতে পারে নি।"[60]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য বর্ণনায় বলেন:

يُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤُسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ

অর্থাৎ "দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জান্নাতি ব্যক্তিকে বেহেশত থেকে ঘুরিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করা হবে-হে আদম সন্তান! তুমি কি দুনিয়াতে কখনো দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিলে? তোমার উপর দিয়ে কি কোন কঠিন পর্যায় অতিক্রম করেছ? সে বলবে: না। হে আল্লাহ! দুনিয়াতে আমার উপর কখনও দুঃখ-দুর্দশা আসে নি। এবং আমি কোন কঠিন পর্যায়কে অবলোকন করি নি।" [61]

যখন আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন সেখানে অত্যন্ত সুখে ও শান্তিতে বসবাস করবেন। কোন রোগ-বালাই, যন্ত্রণা, চিন্তা অথবা মৃত্যু সেখানে থাকবে না। আপনার

---

[58] *সহীহ বুখারী,* #৬৫৭১ এবং *সহীহ মুসলিম,* #১৮৬; *সহীহ মুসলিম,* #১৮৮ এবং *মুসনাদ আহমাদ,* #১০৮৩২ -এ বর্ণিত।

[59] *সহীহ বুখারী,* #৬৫৬৮ এবং *মুসনাদ আহমাদ,* #১৩৩৬৮।

[60] *সহীহ মুসলিম,* #২৮২৫ এবং *মুসনাদ আহমাদ,* #৮৬০৯।

[61] *সহীহ মুসলিম,* #২৮০৭ এবং *মুসনাদ আহমাদ,* #১২৬৯৯।

উপরে থাকবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। আপনি সেখানে হবেন চিরস্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (٥٧)﴾

অর্থাৎ "আর যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে আমি তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবহমান থাকবে। তারা সেখানে থাকবে চিরস্থায়ী। তাদের সাথে থাকবে পবিত্র সঙ্গিনী। আমি তাদেরকে সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করাবো।" (সূরা আন-নিসা: ৫৭)

(জান্নাত ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে www.islam-guide.com/hereafter ব্রাউজ করতে পারেন।)

২. জাহান্নাম থেকে মুক্তি

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

অর্থাৎ "নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কুফরী অবস্থায় মারা গেছে তারা যদি আযাবের বিনিময়ে সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও দেয় তা গ্রহণ করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।" (সূরা আলে-ইমরান: ৯১)

অতএব, জাহান্নাম থেকে মুক্ত হওয়া ও জান্নাতে প্রবেশ করার এটাই (ইসলাম) একমাত্র সুযোগ। কারণ, কোন ব্যক্তি কাফের অবস্থায় মারা গেলে দুনিয়ায় এসে ঈমান আনার কোন পথ খোলা থাকবে না। কিয়ামতের দিন কাফেরের কি পরিস্থিতি হবে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে তা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٧)

অর্থাৎ "আর আপনি যদি দেখেন, যখন তাদেরকে দোযখের উপর দাঁড় করানো হবে। তারা বলবে: কতই না ভালো হত, যদি আমরা পুনঃপ্রেরিত হতাম; তাহলে, আমরা স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।" (সূরা আল-আন'আম: ২৭)

দ্বিতীয়বার তাদের কাউকে আর তাওবার জন্য ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ

অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী দোযখী ব্যক্তিকে দোযখ থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করবেন: হে আদম সন্তান! তুমি কি দুনিয়ায় কখনও সুখ-শান্তির দেখা পেয়েছ? তোমার কাছে কি কখনও সুখের সময় এসেছে? সে বলবে: না, হে আল্লাহ! আমি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দেখা পাই নি।[62]

৩. আসল সুখ ও আত্মিক শান্তি:

আমরা আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধ মেনে দুনিয়াতে সৌভাগ্য ও আত্মিক শান্তি নিশ্চিত করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾

অর্থাৎ "যারা ঈমান আনে তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে।" (সূরা আর-রা'দ: ২৮)

অপরদিকে যারা আল্লাহ তা'আলার কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় দুনিয়ায় তাদের জীবন কণ্টকময় হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤)﴾

অর্থাৎ "আর যে আমার জিকির (স্মরণ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন নির্বাহের পথ সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" (সুরা তাহা: ১২৪)

এখান থেকেই আয়াতের ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কেন কিছু কিছু মানুষ প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েও প্রকৃত শান্তি না পেয়ে আত্মহত্যা করে! উদাহরণস্বরূপ— "Cat Stevens" মুসলিম হয়ে "ইউসুফ ইসলাম" নাম ধারণ করেছেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত পোপ-সংগীত-শিল্পী। তার এক রাত্রের আয়ের পরিমাণই ছিল ১,৫০,০০০ ডলার। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর সত্যিকার শান্তিলাভ করেছেন যা তিনি অর্থের প্রাচুর্য সত্ত্বেও লাভ করতে পারেন নি।

[62] *সহীহ মুসলিম*, #২৮০৭ এবং *মুসনাদ আহমাদ*, #১২৬৯৯।

নও-মুসলিমদের ঘটনাসমূহ পড়তে http://www.islam-guide.com/stories ব্রাউজ করতে পারেন অথবা, "*Why Islam is our Only Choice*"[63] বইটি পড়তে পারেন। এই ওয়েবসাইটের লিংকটিতে ও উক্ত বইয়ে আপনি পাবেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পেশার নও মুসলিমদের চিন্তা-ভাবনা ও অনুভূতি; যারা বিভিন্নজন বিভিন্ন স্তরের শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব, যাদের কৃষ্টি-কালচার ও ভিন্ন ভিন্ন।

৪. সত্যিকার তাওবা দ্বারা বিগত জীবনের গুনাহ ক্ষমা

কেউ যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলা তার বিগত জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দেন। হাদীসে এসেছে—

يروى أن عمرو بن العاص جاء إلى النبى صلى الله عليه و سلم و قال: قُلْتُ للنبى صلى الله عليه و سلم ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ. فَبَسَطَ يَمِينَهُ فَقَبَضْتُ يَدِى. قَالَ « مَا لَكَ يَا عَمْرُو ». قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ « تَشْتَرِطُ بِمَاذَا ». قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِى. قَالَ « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه.

অর্থাৎ বর্ণিত আছে, আমর ইবনুল আস রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। তিনি বলেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম: আপনার হাত প্রসারিত করুন আমি আপনার হাতে বায়'আত হব। তিনি তার হাত সম্প্রসারণ করলেন। আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমার কি হয়েছে হে আমর?" আমি বললাম: আমি শর্ত করতে চাই। তিনি বললেন: "কি শর্ত করতে চাও?" আমি জবাব দিলাম: আমাকে যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তুমি কি জানো না যে, ইসলাম তার পূর্বেকার সবকিছুকে (গুনাহ) ধ্বংস করে দেয়?"[64]

---

[63] গ্রন্থটি রচনা করে আব্দুল্লাহ এইচ. শহীদ। গ্রন্থটির এক কপি দেখতে ভিজিট করতে পারেন: http://www.islam-guide.com/stories

[64] *সহীহ মুসলিম*, #১২১ এবং *মুসনাদ আহমাদ*, #১৭৩৫৭।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলাম সংক্রান্ত সাধারণ জ্ঞান

ইসলাম কি?

ইসলাম হল তুমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত বিধানকে মেনে চলবে।

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস:

১. আল্লাহর উপর ঈমান

একজন মুসলিম একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। যার কোন সন্তান-সন্ততি ও অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য নন। নিশ্চয় তিনিই সত্য প্রভু। তিনি ছাড়া আর অন্য যাদেরকে মানুষ ইবাদাত করে সবই মিথ্যা। আল্লাহ তা'আলার অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলি রয়েছে। তার প্রভুত্ব ও গুণাবলীতে কারো কোন অংশীদারিত্ব নেই। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিজের পরিচয় উপস্থাপন করেছেন।

আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)﴾

অর্থাৎ "আপনি বলুন, আল্লাহ তা'আলা এক ও একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।" (সুরা আল-ইখলাস)

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারও কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করা বা কোন ধরণের উপাসনা করা যাবে না। বরং, এ সবকিছুরই হকদার একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

আল্লাহ তা'আলা একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক। তিনি সৃষ্টিকর্তা, শাসনকর্তা এবং চিরঞ্জীব। তিনি সব কিছুকে পরিচালনা করেন। তিনি তার সৃষ্টির কারও প্রতি মুখাপেক্ষী নন। বরং, তার সৃষ্টির সবাই তাদের নিজ নিজ প্রয়োজনে তার উপর নির্ভর করে।

তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্ববিজ্ঞ। গোপন, প্রকাশ্য, বিশেষ বা সাধারণ সবকিছুই তার নিরবচ্ছিন্ন নজরদারিতে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জানেন যা হয়েছে, হবে এবং তা কিভাবে হবে। জমিনে কোন কিছুই তার অনুমতি ছাড়া হয় না। তিনি যা চান তা হয় আর যা চান না তা হয় না। তার ইচ্ছা সমস্ত সৃষ্টির ইচ্ছার উপরে। তিনি সব কিছুর উপর শক্তিমান; সর্বশক্তিমান। তিনি পরম দয়ালু সর্বাধিক উপকারী। একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোন সন্তানের উপর তার মাতৃস্নেহ যেমন প্রবল আল্লাহ তা'আলা তার থেকেও অনেক বেশি ভালবাসেন তার বান্দাকে।[65] আল্লাহ তা'আলা জুলুম ও সীমালঙ্ঘন থেকে মুক্ত। তিনি তার সমস্ত কাজ ও নির্দেশে অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান। কেউ যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছু চাওয়ার ইচ্ছা করে সরাসরি চাইতে পারে কারও মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় না।

আল্লাহ তা'আলা ঈসা আ. তথা যীশু নন। যীশুও আল্লাহ নন।[66] বরং ঈসা আ. নিজেই নিজেকে স্রষ্টা হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٧٢)﴾

অর্থাৎ "যারা বলে মারইয়াম তনয় ঈসা আ.-ই আল্লাহ, তারা কাফের। অথচ, ঈসা আ. বলেছেন— হে বনী ইসরাইল! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার স্থাপন করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন। তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোনই সাহায্যকারী নেই।" (সূরা আল-মায়েদাহ: ৭২)

আল্লাহ তিনজন নন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٣) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٧٤) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٧٥)﴾

---

[65] *সহীহ বুখারী*, #৫৯৯৯ এবং *সহীহ মুসলিম*, #২৭৫৪।

[66] ১৯৮৪ সালের ২৫ শে জুন লন্ডনের এসোসিয়েশন প্রেস সূত্রে প্রকাশ— ইংল্যান্ডের অধিকাংশ খ্রিষ্টান বিশপ বলেন: যীশুখ্রিষ্টকে স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করা জরুরি নয়। ইংল্যান্ডের ৩৯ জন বিশপের মধ্যকার ৩১ জনের মতই এটা। আর উক্ত ৩১ জন বিশপের মধ্যে ১৯ জন বলেন: যীশুখ্রিষ্টকে আল্লাহর সর্বোচ্চ প্রতিনিধি বলে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট।

অর্থাৎ “নিশ্চয় তারা কাফের যারা বলে— আল্লাহ তিনের এক; অথচ, এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তারা যদি স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে, তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিপতিত হবে। তারা আল্লাহর কাছে কেন তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে না?! আল্লাহ তা'আলা যে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। মারইয়াম তনয় ঈসা আ. রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তার পূর্বে অনেক রাসূল অতীত হয়েছেন আর তার মাতা একজন সত্যবাদিনী। তারা উভয়েই খাদ্য খেতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্য কিরূপ যুক্তি প্রমাণ বর্ণনা করি। আবার দেখুন, তারা উলটা কোন দিকে যাচ্ছে।” (সূরা আল-মায়েদাহ: ৭৩-৭৫)

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন— একথা বিশ্বাস করা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। তিনি তার কোন ফিরিশতার সাথে কুস্তি করেছেন, তিনি মানবজাতির উপর হিংসা করেছেন বা তিনি কোন মানুষের ভিতরে মানুষের আকৃতিতে আছেন এ সব ধারণাও ইসলাম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। এ ছাড়া ইসলাম মানুষের কোন আকৃতির সাথে আল্লাহ তা'আলার সম্পৃক্ততাকে প্রত্যাখ্যান করে। কেননা, এগুলো সবই কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা সবকিছুরই ঊর্ধ্বে। তিনি যে কোন প্রকার অপূর্ণাঙ্গতা থেকে মুক্ত ও দূরে। আল্লাহ তা'আলা ক্লান্ত হন না এবং তাকে নিদ্রা বা তন্দ্রা স্পর্শ করে না।

আরবি শব্দ “ٱللَّٰه” (আল্লাহ) -এর অর্থ হচ্ছে— “প্রতিপালক, একক উপাস্য ও স্রষ্টা, যিনি বিশ্বজগতের সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন।” ‘ٱللَّٰه’ শব্দটি রব ও উপাস্য অর্থে আরব মুসলিম ও খ্রিষ্টানগণ ব্যবহার করে থাকে। এক ও একক উপাস্য ব্যতীত অন্য কোনো অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। এ শব্দটি কুরআন শরীফে ২১৫০ বারেরও বেশিবার ব্যবহার করা হয়েছে। ঈসা আ. সাধারণত যে ভাষায় কথাবার্তা বলতেন, আরবি ভাষার সাথে গভীর সম্পর্কশীল সেই আরামীয় ভাষায় إِلَٰه শব্দটি “ٱللَّٰه” অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. ফেরেশতাদের উপর ঈমান

মুসলিমরা ফেরেশতাদের সম্বন্ধে বিশ্বাস করেন যে, তারা আল্লাহ তা'আলার এক সম্মানিত সৃষ্টি। তারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইবাদাত করেন। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করেন এবং তার আদেশ ছাড়া কোন কাজ করেন না। ফেরেশতাদের মধ্যকার জিবরাইল আ. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী (কুরআন) নিয়ে আসতেন।

৩. আসমানী কিতাবের উপর ঈমান

মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা‘আলা তার রাসূলদের উপর ওহী হিসেবে আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন ও মানুষের জন্য সত্য দ্বীনের প্রমাণ হিসেবে। এই আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অন্যতম যা আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনকে হেফাজতের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন। যেন এর মাঝে কোন পরিবর্তন ও বিকৃতি না ঘটে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)

অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আমি এই কুরআনকে নাযিল করেছি আর আমিই এর হেফাজতকারী।” (সূরা আল-হিজর: ৯)

৪. নবী-রাসূলদের উপর ঈমান

মুসলিমগণ আদম আ. থেকে শুরু করে নূহ, ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়া‘কুব, ও ঈসা আ. প্রমুখ নবীদের উপর বিশ্বাস করেন। তারা বিশ্বাস করেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে সর্বশেষ রিসালাত নিয়ে এসেছেন, যা পূর্ববর্তী চিরন্তন রিসালাতকেই দৃঢ় করে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত শেষ নবী ও রাসূল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠)﴾

অর্থাৎ “মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কোন (প্রাপ্তবয়স্ক) ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ তা‘আলা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।” (সূরা আল-আহযাব: ৪০)

মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন— সমস্ত নবী আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ। এই সমস্ত নবীর কারও ভিতরে স্রষ্টা তথা আল্লাহ তা‘আলার কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

৫. শেষ দিবসের উপর ঈমান

মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে, শেষ দিবসে (পুনরুত্থিত হওয়ার দিন) সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের কর্মকাণ্ড ও বিশ্বাসের হিসাব নিকাশ নিবেন।

৬. তাকদীরের উপর ঈমান

মুসলিমরা তাকদীরের উপর বিশ্বাস করে। তবে, এর অর্থ এই নয় যে, মানুষদেরকে তাদের কাজ-কর্মে স্বাধীনতা দেয়া হয় নি। বরং, মুসলিমরা তাদের কাজে আল্লাহ তা'আলা স্বাধীনতা দিয়েছেন বলে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ তাদের স্বাধীনতা আছে ভাল ও মন্দ থেকে বেছে নেয়ার। তারা ভালো-মন্দ থেকে একটি নির্বাচন করার দায়-দায়িত্ব বহন করবে। তাকদীরের উপর বিশ্বাস চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সেগুলো হল:

1. আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই জানেন। অর্থাৎ তিনি জানেন কী হয়েছে এবং আগামীতে কী হবে।
2. আল্লাহ তা'আলা যা কিছু হয়েছে বা হবে সবকিছুকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।
3. আল্লাহ যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয় না।
4. আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।

(ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে www.islam-guide.com/beliefs ব্রাউজ করতে পারেন।)

কুরআন ব্যতীত ইসলামের অন্য কোন উৎস আছে কি?

হ্যাঁ, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ বা হাদিস (রাসূল সা. এর কথা, কাজ ও মৌন-সম্মতি) ইসলামের দ্বিতীয় উৎস। আর সুন্নাহ বা হাদীস হল আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ত সূত্রে সাহাবীদের থেকে সংকলিত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও মৌন-সম্মতি। সুন্নাহ বা হাদীসের উপর বিশ্বাস করা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু হাদীস:

- مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

অর্থাৎ “মুমিনদের পরস্পরিক দয়া, সহমর্মিতা ও হৃদ্যতার দৃষ্টান্ত একটি দেহের মত। যখন তার মধ্যকার কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয় তাতে সমস্ত শরীর আক্রান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়ে।”[67]

▪

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا

অর্থাৎ “মুমিনদের মধ্যে সেই লোকই পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার। যার স্বভাব-চরিত্র সর্বোত্তম। আর তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীদের নিকট উত্তম।”[68]

▪

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

অর্থাৎ “তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন হতে পারবে না; যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য পছন্দ না করবে।”[69]

▪

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

অর্থাৎ “যারা দয়া করে পরম দয়ালু আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি সদয় হন। তোমরা দুনিয়ায় যারা আছে তাদের প্রতি সদয় হও; বিনিময়ে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হবেন।”[70]

▪

تبسمك في وجه أخيك لك صدقة

অর্থাৎ “মুসলিম ভাইয়ের সামনে তোমার মুচকি হাসি সাদকাহ হিসেবে গণ্য হবে।”[71]

---

[67] *সহীহ বুখারী*, #৬০১১ এবং *সহীহ মুসলিম*, #২৫৮৬।

[68] *মুসনাদ আহমাদ*, #৭৩৫৪ এবং *তিরমিযী*, #১১৬২।

[69] *সহীহ বুখারী*, #১৩ এবং *সহীহ মুসলিম*, #৪৫।

[70] *তিরমিযী*, #১৯২৪ এবং *আবু দাউদ*, #৪৯৪১।

[71] *তিরমিযী*, #১৯৫৬ এ বর্ণিত।

▪

الكلمة الطيبة صدقة

অর্থাৎ "উত্তম কথাবার্তাও সাদকাহ হিসেবে গণ্য হবে।"[72]

▪

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ

অর্থাৎ "যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে।"[73]

▪

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা-সুরত ও ধন-সম্পদের দিকে তাকাবেন না। বরং, তিনি তোমাদের অন্তরসমূহ ও কর্মকে দেখবেন।" [74]

▪

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

অর্থাৎ "তোমরা শ্রমিকদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনা দিয়ে দাও তার শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই।"[75]

▪

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَ مِنِّى. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِى هَذِهِ الْبَهَائِمِ لأَجْرًا فَقَالَ « فِى كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

অর্থাৎ "এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। পিপাসা লাগলে সে একটি কূপে নেমে পানি পান করে পিপাসা মেটাল। সেখান থেকে বের হয়ে দেখতে পেল যে, একটি

[72] *সহীহ বুখারী*, #২৯৮৯ এবং *সহীহ মুসলিম*, #১০০৯।

[73] *সহীহ বুখারী*, #৬০১৯ এবং *সহীহ মুসলিম*, #৪৮।

[74] *সহীহ মুসলিম*, #২৫৬৪।

[75] *ইবন মাজা*, #২৪৪৩।

কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে কর্দমাক্ত মাটি চাটছে। লোকটি বলল: পিপাসায় আমার যে অবস্থা হয়েছিল তারও ঠিক একই পরিণতি হয়েছে। সে কূপের ভিতরে নেমে নিজের মোজা ভর্তি করে পানি তুলে এনে কুকুরের সামনে ধরল। কুকুরটি পানি পান করে জীবন ফিরে পেল। আল্লাহ লোকটির কাজের শুকরিয়া আদায় করলেন এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন।" সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! জন্তুকে পানি পান করানো বা তার সাথে ভাল ব্যবহার করায়ও কি সাওয়াব আছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীতেই সাওয়াব আছে।"[76]

কিয়ামতের দিন সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, ইহকালীন জীবন পরকালীন জীবনের একটি প্রস্তুতি। দুনিয়ার এ জীবন আখেরাতের জীবনের পরীক্ষাকেন্দ্র। বিশ্বজগত ধ্বংসের পরে এই দিনটি আগমন করবে। মৃত-ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর সামনে হিসাব-নিকাশের জন্য উত্থিত করা হবে। এ দিনটি হবে একটি নতুন জীবনের শুরু, যার কোন শেষ নেই। এ দিনকেই বলা হয় কিয়ামতের দিন।

প্রত্যেক মানুষ তাদের নিজ নিজ বিশ্বাস ও কর্মফলের মুখোমুখি হবে। যারা " لا إله إلا الله محمد رسول الله" (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) অর্থ: "আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল"— এতে বিশ্বাস করে মারা গেছে, তারা মুসলিম। তারা তাদের কর্মফল হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨٢)﴾

অর্থাৎ "আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে তারা হবে জান্নাতি। সেখানে তারা চিরস্থায়ী অবস্থান করবে।" (সূরা আল-বাকারা: ৮২)

আর যারা "لا إله إلا الله محمد رسول الله" (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) —তে বিশ্বাস স্থাপন না করে মারা যাবে তারা মুসলিম বলে গণ্য হবে না। তারা

[76] *সহীহ বুখারী*, #২৪৬৬ এবং *সহীহ মুসলিম*, #২২৪৪।

চিরদিনের জন্য জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)﴾

অর্থাৎ “আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছুকে ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করবে তা কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য হবে না। আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।” (সূরা আলে-ইমরান: ৮৫)

তিনি আরও বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٩١)﴾

অর্থাৎ “নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কুফরী অবস্থায় মারা গেছে তারা যদি আজাবের বিনিময়ে সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও দেয় তবুও তা গ্রহণ করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।” (সূরা আলে-ইমরান: ৯১)

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে– আমি ধারণা করি যে, ইসলাম উত্তম ধর্ম; কিন্তু আমি যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি তাহলে পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব, ও অন্যান্য লোকেরা আমার উপর অত্যাচার-নির্যাতন ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে। তাহলে, আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি দোযখ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব?

এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে– আমরা পবিত্র কুরআন মাজীদে দেখতে পাই আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)﴾

অর্থাৎ “আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছুকে ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করবে তা কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য হবে না। আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।” (সূরা আলে-ইমরান: ৮৫)

আল্লাহ তা‘আলা রাসূল হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করার পরে কেউ নিজেকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের সাথে সম্পৃক্ততা দেখালে আল্লাহ তা‘আলা তা গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা, ও অভিভাবক। তিনি দুনিয়ার সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের যতসব কল্যাণ, দয়া-

মায়া, মমতা সবকিছুই তার কাছ থেকে এসেছে। এসবের পরেও যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে না এবং তার মনোনীত ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা ইসলামকে মেনে নেবে না তাকে পরকালে শাস্তি দেয়াই ন্যায়পরায়ণতার কাজ। তবে, ইহকালে আমাদেরকে সৃষ্টির মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে একক সত্ত্বা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত বা আনুগত্য করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)﴾

অর্থাৎ “আমি মানুষ ও জ্বিন-জাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদাতের জন্য।” (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬)

আমরা যেখানে বসবাস করছি তা খুবই সংক্ষিপ্ত জীবন। কিয়ামতের দিনে কাফেররা বিশ্বাস করবে যে, তারা দুনিয়ায় বসবাস করেছে শুধুমাত্র একদিন বা তার কিছু অংশ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (١١٢) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (١١٣)﴾

অর্থাৎ “আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: তোমরা বছরের গণনায় পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে— আমরা একদিন বা তার কিছু অংশ পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলাম। অতএব, গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।” (সূরা আল-মুমিনূন : ১১২-১১৩)

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١١٥) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (١١٦)﴾

অর্থাৎ “তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে অযথাই সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার দরবারে ফিরে আসতে হবে না? অতএব, শীর্ষ মহীয়ান আল্লাহ তা‘আলা তিনিই সত্যিকার মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন মা‘বুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।” (সূরা আল-মুমিনুন: ১১৫-১১৬)

পরকালের জীবনই আসল জীবন। সেটা শুধুমাত্র আত্মার জীবনই নয় বরং, তা শারীরিক জীবনও। আমরা সেখানে বসবাস করব আমাদের আত্মা ও শরীর উভয়টি নিয়েই। দুনিয়ার জীবনের সাথে আখেরাতের জীবনের তুলনা করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ

অর্থাৎ "আল্লাহর কসম! কোন ব্যক্তি তার আঙ্গুলকে সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়ার পর (আঙ্গুল সরিয়ে নিলে) তার কাছে সমুদ্রের তুলনায় যতটুকু অংশ (পানি) আসে, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া তেমনই।"[77]

এমনিভাবে আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের মূল্য অথৈ সমুদ্রের তুলনায় কয়েক ফোটা পানির সমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইসলাম গ্রহণের নিয়ম

কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র "لا إله إلا الله محمد رسول الله" ***(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)*** বলার দ্বারাই অমুসলিম থেকে মুসলিমে পরিণত হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রবেশ করে। বাক্যটির অর্থ: **"আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ (উপাস্য) নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল**"।

প্রথম অংশ "আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই" এর অর্থ হচ্ছে— একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাসনা পাওয়ার অধিকার রাখে না। তার কোন অংশীদার বা সন্তান-সন্ততি নেই।

মুসলিম হতে হলে ব্যক্তিকে আরও অবশ্যই:—

- মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অবতীর্ণ আক্ষরিক ওহী হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।
- কিয়ামতের দিন বা পুনরুত্থান দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার ফলশ্রুতি হিসেবে অবশ্যই সে দিন উপস্থিত হবে।
- ইসলামকে দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে।
- একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত বা উপাসনা করবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ

[77] *মুসনাদ আহমাদ*, #১৭৫৬০ এবং *সহীহ মুসলিম*, #২৮৫৮।

إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِى وَأَنَا رَبُّكَ. أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ

অর্থাৎ "কোন বান্দা তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি খুশি হন, যে মরুভূমিতে সফরে ছিল। অতঃপর বাহন তার পিঠের উপরে রক্ষিত খাদ্য ও পানীয় নিয়ে পালিয়ে গেল। সে ব্যাপকভাবে খুঁজাখুঁজি করে না পেয়ে নিরাশ হয়ে গাছের নিচে এসে ঘুমিয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় (ঘুম থেকে জেগে) দেখল তার সওয়ারী তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। সে তার লাগাম ধরে অত্যন্ত খুশি হয়ে বলল: হে আল্লাহ!তুমি আমার বান্দা এবং আমি তোমার রব বা প্রতিপালক। অত্যন্ত খুশি হয়ে সে ভুল করে বসল।"[78]

বিল্ডিংয়ের প্রবেশ পথে লেখা রয়েছে: لا إله إلا الله محمد رسول الله : "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ (উপাস্য) নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল"

---

[78] *সহীহ বুখারী,* #৬৩০৯ এবং *সহীহ মুসলিম,* #২৭৪৭।

কুরআন মাজীদের আলোচ্য-বিষয়

কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব। একজন মুসলিমের যাবতীয় বিশ্বাস ও কাজকর্মের উৎস। মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই তাতে আলোকপাত করা হয়েছে। তাতে রয়েছে শিক্ষা, ইবাদাত, আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন বিষয়ের বিধানবলি ও হিকমাত অবলম্বন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়।

তবে এর মৌলিক বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক। তা একই সময়ে মুসলিমকে সুষ্ঠু সমাজ গঠন, মানুষের সার্বিক পথচলা এবং স্বনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

উল্লেখ্য যে, কুরআন মাজীদ শুধুমাত্র আরবি ভাষায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহীর নাম। অতএব, ইংরেজিসহ যে কোন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ "কুরআন" নয় এবং তা পাঠ করাও কুরআন তেলাওয়াত বলে গণ্য হবে না। বরং, সেগুলো কুরআন মাজীদের অর্থের অনুবাদ। আরবি ভাষায় নাযিলকৃত ওহী ছাড়া অন্য কোন কুরআন নেই।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয়

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের আগেই তার পিতা এবং ছেলেবেলায় মাতা মারা যান। প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশে তার চাচা তাকে দেখাশোনা করেন। রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরক্ষর অবস্থায় বেড়ে ওঠেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন না। এভাবেই (নিরক্ষর) তিনি জীবন সন্ধিক্ষণে উপনীত হন। নবুওয়াত লাভের আগে তার বংশের লোকেরা শিক্ষা থেকে দূরে ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল নিরক্ষর। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আস্তে আস্তে বেড়ে উঠলে তিনি সত্যবাদী, একনিষ্ঠ, দয়ালু ও বিশ্বস্ত হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আমানতদারিতায় তার অবস্থান এত উপরে উঠে

গেল যে, লোকেরা তাকে "আল-আমীন" তথা *বিশ্বাসী* উপাধিতে ভূষিত করল।[79] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত উঁচু মাপের ধার্মিক ছিলেন। বংশীয় লোকদের পৌত্তলিকতা ও কঠোর মনোভাবাপন্ন অবস্থাকে তিনি অপছন্দ করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন চল্লিশতম বছরে পদার্পণ করলেন তখন জিবরাইল আ. এর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম ওহী প্রাপ্ত হলেন। এভাবে সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে তার নিকট ওহী আসার মাধ্যমে কুরআন নাযিল সম্পন্ন হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার উপর নাযিলকৃত কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন তখন তিনি এবং তার সাথে থাকা সাহাবীদের ছোট্ট একটি গ্রুপ কাফের মুশরিকদের পক্ষ থেকে ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হন। ক্রমান্বয়ে এ অত্যাচারের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। শেষপর্যন্ত ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে আল্লাহ তা'আলা তাকে হিজরত তথা দেশত্যাগ করার নির্দেশ দেন। মক্কা থেকে ২৬০ মাইল উত্তরে মদীনায় তার হিজরত ইসলামী ক্যালেন্ডার বা বর্ষপঞ্জির শুরু হিসেবে ধর্তব্য হয়। এর কয়েকবছর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীরা মক্কায় ফিরে আসতে সক্ষম হন। তারা সেখানে এসে শত্রুদেরকে ক্ষমা করে দেন। ৬৩ বছর বয়সে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর আগে আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করে। তার মৃত্যুর পরবর্তী মাত্র কয়েকশত বছরে পূর্বদিকে চীন থেকে শুরু করে পশ্চিমদিকের স্পেন পর্যন্ত ইসলাম দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত ইসলামের এ প্রসারের কারণ হল— তার শিক্ষা স্পষ্ট এবং সত্য। কেননা, ইসলাম একক সত্ত্বা আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকে, যিনি একমাত্র উপাসনা পাবার হকদার।

[79] *মুসনাদ আহমাদ,* #১৫০৭৮।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ, মসজিদে নববী

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সম্মান, ন্যায়-পরায়ণতা, দয়া-মায়া, সততা ও সাহসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এছাড়া তিনি মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত প্রকার খারাপ গুণাবলি থেকে ছিলেন পবিত্র এবং অনেক দূরে। তার সংগ্রাম ছিল আখেরাতে প্রতিদান পাওয়ার নিমিত্তে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার রাস্তায়। এতদসত্ত্বেও তিনি তার সব কথা, কাজ ও আচার-আচরণে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতেন।

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য www.islam-guide.com/muhammad ব্রাউজ করতে পারেন।)

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় ইসলামের ভূমিকা

ইসলাম মানুষকে তার ব্রেন ও চিন্তা-শক্তিকে কাজে লাগাতে নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামের পরিধি ব্যাপকতা লাভের কয়েকবছরের মধ্যেই উন্নত ও সুন্দর সভ্যতা দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়েছে। দিকে দিকে বহু বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও নতুন এবং পুরাতন চিন্তাধারার সমন্বয়ে চিকিৎসা, গণিত, পদার্থ, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, স্থাপত্যবিদ্যা, সাহিত্য ও ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপকতা লাভ করে। পরবর্তীতে মুসলিম শাসনের মাঝামাঝি সময়ে বীজগণিত, আরবি সংখ্যা, এবং শূন্যতত্ত্ব (গণিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম) ইউরোপে স্থানান্তরিত হয়।

মুসলিমরা এস্ট্রোল্যাব, কুয়াডরান্ট (বৃত্তের পরিধি মাপনী) ও নাবিকদের জন্য চমৎকার ম্যাপ তৈরির মত অনেক যন্ত্রপাতি তৈরি করেন, যা ব্যবহার করে আজকের ইউরোপ উন্নয়নের মুখ দেখতে সক্ষম হয়েছে।

এস্ট্রোল্যাব (Astrolabe) : বিজ্ঞানের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। মুসলিমগণ এটাকে আবিষ্কার করেছিলেন। পাশ্চাত্যে বর্তমান আধুনিক যুগেও এটা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
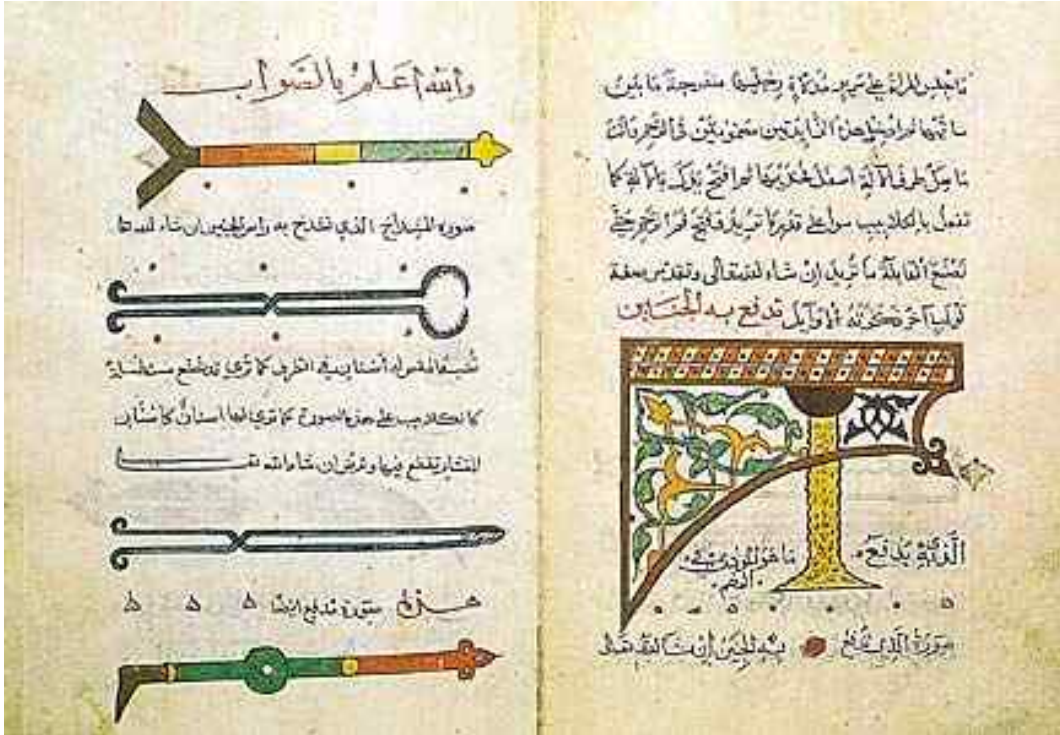
মুসলিম পদার্থবিজ্ঞানীরা অপারেশনের কাজে মনোযোগ দিয়েছিলেন। চিত্রের মত অনেকগুলো যন্ত্র তারা অপারেশনের জন্য আবিষ্কার করেছিলেন।

ঈসা আ. সম্বন্ধে মুসলিমদের বিশ্বাস

মুসলিমরা ঈসা আ. কে সম্মান করে তাকে মনের মণিকোঠায় স্থান দিয়ে থাকে। তারা তাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী হিসেবেই মূল্যায়ন করে থাকে। তারা কঠোরভাবে এ

কথা বিশ্বাস করে যে, তার জন্ম হয়েছে কুমারী মায়ের গর্ভে। কুরআন শরীফে তার নামে একটি সূরাও আছে— সূরা মারইয়াম। কুরআন শরীফে ঈসা আ. এর জন্মকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে:—

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٤٥) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (٤٦) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٧)﴾

অর্থাৎ "আর যখন ফেরেশতাগণ বললেন: হে মারইয়াম! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তার এক কালিমা'র (বাণী) সুসংবাদ দিচ্ছেন যার নাম হল মাসীহ; মারইয়াম তনয় ঈসা আ.। দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি হবেন মহা সম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি হবেন সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বললেন: হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোন পুরুষ স্পর্শই করে নি? আল্লাহ বললেন: এভাবেই আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন তখন বলেন: "হও" অমনি তা হয়ে যায়।" (সূরা আলে-ইমরান : ৪৫-৪৭)

আল্লাহ তা'আলা আদম আ. কে যেভাবে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন ঠিক সেভাবেই তাঁরই নির্দেশে ঈসা আ. এর জন্ম হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٥٩)﴾

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার কাছে ঈসা আ. এর দৃষ্টান্ত হল আদম আ. এর মত। তাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাকে বলেছেন: হও। অতঃপর তা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেছে।" (সূরা আলে-ইমরান: ৫৯)

আল্লাহ তা'আলা নবী হিসেবে ঈসা আ. কে অনেক মু'জিযা দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা নিজেই বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ বলেন:

﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾

অর্থাৎ "আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শনসহ এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরি করে তাতে ফুঁৎকার দিই অমনি তা আল্লাহর হুকুমে উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায়। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে। এবং আমি আল্লাহ তা'আলার হুকুমে জীবিত করে দিই মৃতকে। আমি তোমাদেরকে বলে দিই যা তোমরা খেয়ে আস আর যা ঘরে রেখে আস।" (সূরা আলে-ইমরান: ৪৯)

মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈসা আ. কে শুলে চড়ানো হয় নি। বরং, তার শত্রুদের ইচ্ছা ছিল তাকে শুলে চড়ানোর। আল্লাহ তা'আলা তাকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করে ওখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে অন্য এক ব্যক্তিকে তার মত সাদৃশ্য দিয়ে দিয়েছেন। তারা তাকে ঈসা আ. ভেবে শুলে চড়িয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٧)﴾

অর্থাৎ "আর তাদের এ কথা বলার কারণে যে, আমরা মারইয়াম পুত্র ঈসা আ.কে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল। অথচ, তারা তাকে হত্যাও করেনি আবার শুলেও চড়ায় নি। বরং, তারা ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এ ক্ষেত্রে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে আছে। শুধুমাত্র অনুমান ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চিতভাবেই তারা তাকে হত্যা করে নি।" (সূরা আন-নিসা: ১৫৭)

ঈসা আ. সহ কোন নবী এক আল্লাহর উপর ঈমান ও পূর্ববর্তী নবীদের আনিত দ্বীনের উপর ঈমান আনার মত মৌলিক বিষয়ে পরিবর্তন আনতে প্রেরিত হন নি। বরং, সমস্ত নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছিলেন পূর্ববর্তী নবীগণের আনিত বিষয়কে শক্তিশালী করা ও নতুনভাবে তার বিস্তৃতি ঘটানোর জন্য।[80]

ফিলিস্তিনের মসজিদে আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস)

[80] মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ঈসা আ. এর উপর ইঞ্জিল নাযিল করেছেন। তার কিছু অংশ “New Testament” -এ অবশিষ্ট আছে। কিন্তু, তার অর্থ এই নয় যে, মুসলিমরা বর্তমানে প্রচলিত ইঞ্জিল তথা বাইবেলকে বিশ্বাস করে। কেননা, সেটা ঈসা আ. এর উপর যেভাবে নাযিল হয়েছে অবিকল সেভাবে বর্তমান নেই। তাতে অনেকাংশে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ছাড়াও কিছু অংশকে উহ্য করা হয়েছে। এটা *The Holy Bible (Revised Standard Version)* সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত কমিটির-ই বক্তব্য। এই কমিটি গঠিত হয়েছিল ৩২ জন (গবেষক) পণ্ডিতের তত্ত্বাবধান ও ৫০ জন খ্রিষ্টান-ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সহযোগিতায়। কমিটি *The Holy Bible (Revised Standard Version)* -এর ভূমিকায় (পৃ.iv) স্পষ্টভাষায় লিখেছে- “এই বাইবেল অনেক বার পরিবর্তনের শিকার হয়েছে। এর কোন নির্ভুল কপি নেই। ফলে, আমাদের উচিত ঐ সমস্ত কপিকে অনুসরণ করা, যা গবেষক পণ্ডিতগণ সঠিকের নিকটবর্তী বলে মনে করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন।” পৃ. Vii এ আরও বলা হয়েছে: “পরিবর্তন, সংযোজন ও গোপন করার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে পাদটীকা সংযোজন করা হয়েছে।” বাইবেলের পরিবর্তন সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত জানতে www.islam-guide.com/bible লিংকটি ব্রাউজ করুন।

(ঈসা আ. সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে http://www.islam-guide.com/jesus ব্রাউজ করতে পারেন।)

সন্ত্রাস সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

ইসলাম দয়া ও উদারতার ধর্ম তা সন্ত্রাসকে সাপোর্ট করে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

অর্থাৎ "ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আল-মুমতাহিনা: ৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে নিজ সৈন্যদেরকে নিষেধ করতেন কোন মহিলা বা শিশুকে হত্যা করতে।[81] তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিতেন: "আমানতের খেয়ানত, হত্যায় বাড়াবাড়ি এবং শিশুদেরকে হত্যা না করতে।"[82]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

অর্থাৎ "যে কোন যিম্মিকে (মুসলিম দেশে বসবাসের অনুমতিপ্রাপ্ত অমুসলিম) হত্যা করবে সে বেহেশতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ, তার সুগন্ধি চল্লিশ বছরের সমান দূরত্বের রাস্তা পর্যন্ত পাওয়া যায়।"[83]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগুনে পুড়িয়ে কাউকে শাস্তি দিতে নিষেধ করেছেন।[84]

ইসলাম হত্যাকাণ্ডকে দ্বিতীয় বৃহত্তম অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে।[85] এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন:

---

[81] *সহীহ বুখারী*, #৩০১৫ এবং *সহীহ মুসলিম*, #১৭৪৪।

[82] *সহীহ মুসলিম*, #১৭৩১ এবং *তিরমিযী*, #১৪০৮।

[83] *সহীহ বুখারী*, #৩১৬৬ এবং *ইবন মাজাহ*, #২৬৮৬ ।

[84] *আবু দাউদ*, #২৬৭৫।

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ}

অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বিচার হবে রক্ত প্রবাহের ব্যাপারে (অর্থাৎ আঘাত ও হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে)।"[86]

শুধু মানুষ নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুদের সাথেও সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাদেরকে কষ্ট দেয়াকে হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

অর্থাৎ "একজন মহিলাকে শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র একটি বিড়াল ছানাকে মৃত্যু পর্যন্ত বেঁধে রাখার কারণে। এ কারণেই তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। সে তাকে বেঁধে রাখত, খেতেও দিত না, পানও করাত না। আবার তাকে ছেড়েও দিত না যে সে জমিনে বিচরণ করে কীট-পতঙ্গ খেতে পারে।"[87]

তিনি আরও বলেন:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَ مِنِّى. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لأَجْرًا فَقَالَ « فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

অর্থাৎ "এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। পিপাসা লাগলে সে একটি কূপে নেমে পানি পান করে পিপাসা মেটাল। সেখান থেকে বের হয়ে দেখতে পেল যে, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে কর্দমাক্ত মাটি চাটছে। লোকটি বলল: পিপাসায় আমার যে অবস্থা হয়েছিল তারও ঠিক একই পরিণতি হয়েছে। সে কূপের ভিতরে নেমে নিজের মোজা ভর্তি করে পানি তুলে এনে কুকুরের সামনে ধরল। কুকুরটি পানি পান করে জীবন ফিরে পেল। আল্লাহর লোকটির কাজের শুকরিয়া আদায় করলেন এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন।" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! জন্তুকে পানি পান করানো বা তার সাথে ভাল ব্যবহার করায়ও কি

---

[85] *সহীহ বুখারী,* #৬৮৭১ এবং *সহীহ মুসলিম,* #৮৮।

[86] *সহীহ বুখারী,* #৬৫৩৩ এবং *সহীহ মুসলিম,* #১৬৭৮।

[87] *সহীহ বুখারী,* #২৩৬৫ এবং *সহীহ মুসলিম,* #২৪২২।

সাওয়াব আছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীতেই সাওয়াব আছে।"[88]

এ ছাড়াও যখন খাওয়ার জন্য কোন জন্তু জবেহ করা হয় তখন তাকে যত কম সম্ভব ভয়-দেখানো ও কষ্ট-দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সব কিছুতেই ইহসান তথা সদয় হতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, যখন তোমরা হত্যা করবে তখন সদয়ভাবে তা করবে। যখন তোমরা জবেহ করবে তখনও ইহসান তথা সদয়তার সাথে জবেহ করবে। আর (তোমাদের কেউ যখন জবেহ করবে) সে যেন তার অস্ত্রকে ভালোভাবে ধার দিয়ে নেয় এবং জন্তুকে প্রশান্তি দেয়।"[89]

এ বিধানাবলিসহ ইসলামের অন্যান্য বিধানাবলির আলোকে বলা যায়— যে-সব কাজ নাগরিকদের মনে ভীতির সঞ্চার করে, ঘর-বাড়ি-জিনিস-পত্র ধ্বংস করে দেয় এবং বোমা মেরে নিরীহ নারী-পুরুষ ও শিশুদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি কাজ ইসলাম ও মুসলিমদের দৃষ্টিতে হারাম ও অবৈধ। ইসলাম শান্তি, কল্যাণ ও উদারতার ধর্ম। বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু মুসলিমের চালানো হামলার সাথে অধিকাংশ মুসলিমেরই কোন সম্পৃক্ততা নেই। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায় তাহলে, সে ইসলামী শরীয়তের উপর কলঙ্ক লেপন করেছে বলে গণ্য হবে।

ইসলামে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার

ইসলাম একজন ব্যক্তির জন্য বহু অধিকার নিশ্চিত করেছে। তন্মধ্যে কিছু অধিকার নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল।

ইসলামী দেশে ইসলাম প্রতিটি মানুষের জীবন ও সম্পত্তিকে পবিত্র বলে মনে করে, ব্যক্তি হোক মুসলিম বা অমুসলিম। ইসলাম মানুষের মান-সম্মানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। এজন্য একে অপরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা বা গালি দেয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

---

[88] *সহীহ বুখারী*, #২৪৬৬ এবং *সহীহ মুসলিম*, #২২৪৪।

[89] *সহীহ মুসলিম*, #১৯৫৫ এবং *তিরমিযী*, #১৪০৯।

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

অর্থাৎ "নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান একে অপরের নিকট পবিত্র।"[90]

সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবাদকে ইসলাম সমর্থন দেয় না। কুরআন কঠোরভাবেই মানুষের মধ্যকার সমতাকে নিশ্চিত করেছে তার বাণীর মাধ্যমে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বলেছে:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)﴾

অর্থাৎ "হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী[91]। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও সবকিছুর খবর রাখেন।" (সূরা আল-হুজুরাত: ১৩)

সম্মান, শক্তি ও বংশের অহংকারবশত কোন ব্যক্তি বা জাতি কর্তৃক নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করাকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে সমান করে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং, তাদের মধ্যকার পার্থক্য শুধুমাত্র বিশ্বাস ও তাকওয়ার উপর ভিত্তি করেই নির্ণীত হওয়া উচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

অর্থাৎ "হে মানবজাতি! তোমাদের রব্ব তথা পালনকর্তা একজন। তোমাদের আদি পিতা (আদম আ.) একজন। জেনে রাখ! অনারবের উপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আবার আরবের উপর অনারবেরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই; কালোর উপর সাদা কিংবা

---

90 *সহীহ বুখারী*, #১৭৩৯ এবং *মুসনাদ আহমাদ*, #২০৩৭।

91 তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তি হচ্ছেন যিনি যাবতীয় অপরাধ থেকে দূরে থাকেন, আল্লাহর সকল আদেশ মেনে চলেন, আল্লাহকে ভালবাসেন এবং তাকে ভয় করেন।

সাদার উপর কালোরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই— একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তি ছাড়া (তাকওয়ার উপর ভিত্তি করেই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে)।”[92]

বর্তমানে বিশ্ববাসীর অন্যতম সমস্যা হচ্ছে বর্ণবাদ বা সাম্প্রদায়িকতা। উন্নত দেশগুলো চাঁদে মানুষ প্রেরণ করতে সক্ষম, কিন্তু কোন মানুষকে অপর কোন মানুষকে ঘৃণা করা বা হত্যা করা থেকে ফেরাতে সক্ষম নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই মানবতার মুক্তির সংবিধান ইসলাম বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে কবর দেওয়ার জীবন্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। প্রতি বছর সারা পৃথিবী থেকে প্রায় ২০ লাখ মুসলিম ফরজ হজ্জ আদায় করতে মক্কায় আগমন করেন। তাদের এ মহাসম্মেলন সারা বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বীজ ছড়িয়ে দেয়।

ইসলাম ন্যায়নীতির ধর্ম। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতকে তার মালিকের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দেবার জন্য এবং যখন তোমরা মানুষের মাঝে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করার জন্য। (সূরা আন-নিসা: ৫৮)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)﴾

অর্থাৎ “আর তোমরা ন্যায়ানুগ পন্থায় বিচার কর এবং ইনসাফ কায়েম কর। আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচারকদেরকে ভালবাসেন।” (সূরা আল-হুজুরাত: ৯)

অতএব, প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তার অপছন্দনীয় ব্যক্তির সাথেও ন্যায়বিচার করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾

---

[92] *মুসনাদ আহমাদ,* #২২৯৭৮।

অর্থাৎ ~কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কখনও ন্যায়বিচার না করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায় বিচার কর। এটাই তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী।" (সূরা আল-মায়েদাহ: ৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যের উপর জুলুম নির্যাতন ও তার সাথে খারাপ আচরণ থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ "তোমরা জুলুম (অবিচার) করা থেকে বেচে থাক। কেননা, এই জুলুমই কিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে দাঁড়াবে।"[93]

আর যারা দুনিয়ায় তাদের অধিকার নিতে পারে নি (যে অধিকার তাদের প্রাপ্য ছিল), তারা সে অধিকার আখিরাতে কিয়ামতের দিন প্রাপ্ত হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ "অবশ্যই প্রত্যেক হকদারের হক কিয়ামতের দিন তার নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে।"[94]

ইসলামে নারীর মর্যাদা কী?

ইসলাম বিবাহিতা বা অবিবাহিতা সমস্ত নারীকেই তার পূর্ণ ন্যায্য অধিকার ভোগ করার অধিকারিণী বলে মনে করে। কোন সম্পদে বৈধ পন্থায় মালিকানা গ্রহণ করা ও মালিকানাধীন সম্পদ ব্যবহার করার অধিকার তার আছে, স্বামী, পিতা বা অন্য কারও কর্তৃক তাতে বাধাদান বৈধ নয়। অধিকার আছে ক্রয়-বিক্রয় করার, কাউকে হাদিয়া (উপঢৌকন)ও দান করার। এক কথায় তার সম্পদ যেখানে খুশি সেখানে (বৈধ পন্থায়) ব্যয় করার পূর্ণ অধিকার

[93] *সহীহ বুখারী,* #২৪৪৭ এবং *মুসনাদ আহমাদ,* #৫৭৯৮।

[94] *সহীহ মুসলিম,* #২৫৮২ এবং *মুসনাদ আহমাদ,* #৭১৬৩।

নিশ্চিত করেছে ইসলাম। স্বামী তার স্ত্রীকে যে মাহর প্রদান করে তাতেও তার নিজস্ব এখতিয়ার রয়েছে। ইসলামে (বিবাহিতা) মহিলা নিজের পরিচয়ের জন্য স্বামীর নাম ব্যবহার না করে পরিবারের নাম ব্যবহার করাই নিয়ম।

ইসলাম পুরুষকে নির্দেশ দিয়েছে স্ত্রীদের সাথে সুন্দর আচরণ করার। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ

অর্থাৎ "ঐ ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার যার স্বভাব-চরিত্র সুন্দর; আর তোমাদের মধ্যকার যারা নিজ স্ত্রীদের কাছে উত্তম তারাই উত্তম ব্যক্তি।"[95]

ইসলামে মায়েরা সুউচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন রয়েছে। ইসলাম তাদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বোত্তম হকদার কে? তিনি বললেন: "তোমার মা।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন: তারপর কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমার মা।" সাহাবী আবার জিজ্ঞাসা করলেন: তারপর কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন: "তোমার মা।" সাহাবী চতুর্থবার প্রশ্ন করলেন: তারপর কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার জবাবে বললেন: "তোমার পিতা।"[96]

(ইসলামে মহিলাদের অবস্থান সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে www.islam-guide.com/women ব্রাউজ করতে পারেন।)

ইসলামে পরিবার ব্যবস্থা

মানবসমাজে পরিবার ব্যবস্থা একটা গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক স্থাপনা যা আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। তবে ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থা স্বামী-স্ত্রী, শিশু ও নিকটজনদের অধিকারকে পারস্পরিক ভারসাম্য বজায় রেখে অত্যন্ত চমৎকার ও যথাযথভাবে নিশ্চিত করছে। চমৎকার পারিবারিক বন্ধন ভালোবাসা ও মহানুভবতার সৃষ্টি করে। যা শান্তি ও নিরাপত্তার মাধ্যমে পরিবারে ভারসাম্য বজায় রাখে। এ ব্যবস্থাকে পরিবারের সদস্যদের আত্মিক সমৃদ্ধির উপাদান বলে গণ্য করা হয়। সমাজে চমৎকার শৃঙ্খলার সাথে যৌথ-পরিবার পরিচালিত হয় এবং শিশুরা সেবাযত্নের সাথে বেড়ে ওঠে।

---

[95] *তিরমিযী,* #৩৮৯৫ এবং *ইবন মাজাহ,* #১৯৭৮।

[96] *সহীহ বুখারী,* #৫৯৭১ এবং *সহীহ মুসলিম,* #২৫৪৮।

বৃদ্ধদের সাথে মুসলিমদের ব্যবহার:

মুসলিম বিশ্বে "বৃদ্ধাশ্রম" খুঁজে পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার। কারণ, ইসলামে পিতামাতার সাথে চমৎকার সম্পর্ক রাখার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাদের জীবনের কঠিন সময়ে এটাকে সম্মান ও বরকত লাভে ধন্য হওয়ার সুযোগ হিসেবে গণ্য করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে আমরা আমাদের পিতামাতার জন্য শুধু দোয়া করব এতেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বরং, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে দয়া-মায়া ও সহৃদয়তার বন্ধনে আবদ্ধ থেকে তাদের সাথে সদাচরণ করে যাওয়া; আমাদের শিশুকালে যখন আমাদের কোন শক্তি ছিল না, কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না, তখন তারা নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে আমাদের কল্যাণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের এ অসাধারণ ভূমিকা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা স্মরণ রাখা উচিত। এ জন্যই আমরা মায়ের মর্যাদাকে উচ্চাসনে আসীন দেখতে পাই। কারো পিতামাতা যখন বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন তাদের সাথে উদারতা, সহানুভূতি ও নিজের সুখ দুঃখকে বাজি রেখে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। ইসলামে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের পরেই পিতামাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পিতামাতার কঠিন সময় বার্ধক্য বয়সে তারা অসন্তুষ্ট হন এমন যে কোন কথাবার্তা বলা মুসলিমদের উচিত নয়। কারণ, অকর্মণ্য হয়ে পড়া তাদের কোনো অপরাধ নয়। তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤)﴾

অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের একজন বা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে "উহ" শব্দটিও বলো না, তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে শিষ্টাচারমূলক কথা বল। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা অবনমিত হও এবং বল হে আমার পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি অনুগ্রহ কর, যেমনি তারা আমাকে শৈশবে লালনপালন করেছেন।" (সূরা বানী-ইসরাইল: ২৩-২৪)

ইসলামের পাঁচটি রুকন কী কী?

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ মুসলিম জীবনের মৌলিক কাঠামো সদৃশ। সেগুলো হল— لا إله إلا الله محمد رسول الله বা "আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ বা উপাস্য নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল" এ কথার সাক্ষ্য দেয়া; সালাত কায়েম করা; যাকাত প্রদান করা; রমজানের রোজা রাখা এবং সামর্থবান ব্যক্তির জন্য হজ্জ করা।

১. বিশ্বাসের কালেমা বা لا إله إلا الله محمد رسول الله -এর সাক্ষ্য দেয়া:

বিশ্বাসের সাথে لا إله إلا الله محمد رسول الله *(লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)* অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ বা উপাস্য নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল" উচ্চারণ করবে। প্রথমাংশ "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য নেই" এর অর্থ হল—আল্লাহ তা'আলা ছাড়া উপাসনা পাওয়ার অধিকারী কেউ নেই, তার কোন অংশীদার বা সন্তান নেই। এই বাক্যটিকে 'শাহাদাহ' বলা হয়। এটি একটি সহজ বাক্য, যা পূর্ণাঙ্গ ঈমান/বিশ্বাসের সাথে উচ্চারণ করলে কোনো ব্যক্তি মুসলিমে রূপান্তরিত হয়, যা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। এ সাক্ষ্য ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান স্তম্ভ।

২. সালাত কায়েম করা:

একজন মুসলিম দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করে। প্রতিটি ওয়াক্তের সালাত আদায় করতে কয়েক মিনিটের বেশি সময় লাগে না। সালাত বান্দা ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার যোগাযোগের মাধ্যম। সালাতের সময় বান্দা ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে কোন মাধ্যম অবশিষ্ট থাকে না। সালাত আদায়কারী ব্যক্তি সালাতের মধ্যে আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করে থাকে। সে বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রা. কে সালাত সম্বন্ধে বলেছিলেন:

أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلاَلُ

অর্থাৎ “হে বেলাল! সালাত দ্বারা আমাদেরকে প্রশান্ত করে দাও।”[97] বেলাল রা. ছিলেন একজন সাহাবী। তিনি সালাতের আযান দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাত যথাক্রমে ভোর, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রের প্রথম প্রহরে আদায় করা হয়। একজন মুসলিম খোলা মাঠ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সব স্থানেই সালাত আদায় করতে পারে।

(ইসলামে সালাত সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে http://www.islam-guide.com/prayer ব্রাউজ করতে পারেন। এ ছাড়াও এম. এ. কে. সাকিবের *A Guide to Prayer in Islam* বইটি পড়তে পারেন। উপরের ওয়েবসাইট থেকে এ বইটা সংগ্রহ করা যাবে।)

৩. যাকাত আদায় করা (অভাবীদের সাহায্যার্থে):

সবকিছুর মূল মালিক মহান আল্লাহ তা‘আলা। মানুষের নিকট যে সম্পদ রয়েছে তা তার কাছে আমানত। আরবি “যাকাত” শব্দটি অর্থ একইসঙ্গে পবিত্র হওয়া ও বৃদ্ধি পাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাকাত আদায়ের (পারিভাষিক) অর্থ হল— “বিভিন্ন স্তরের অভাবীদের মাঝে নিজ সম্পদের শতকরা নির্দিষ্ট পরিমাণ (২.৫%) বণ্টন করে দেয়া”।

স্বর্ণ, রৌপ্য ও নগদ ক্যাশের মূল্য ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের সমপরিমাণ হলেই উক্ত পরিমাণ সম্পদ অভাবীদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। এর জন্য ১ চন্দ্রবছর হওয়া শর্ত। প্রদেয় পরিমাণ হল ২.৫%। আমরা আমাদের সম্পদের কিছু অংশ অভাবীদের জন্য ছেড়ে দিয়ে থাকি, আর তা আমাদের সম্পদকে পবিত্র করে। আগাছা ছেঁটে ফেলার সময়ও এরূপ করে থাকি; এটি নতুনভাবে ফসল উৎপাদন করতে সাহায্য করে।

একজন ব্যক্তি বেশি-বেশি, যত-খুশি সাদকাহ ও দান করতে পারে।

৪. রমযানের রোজা:

---

[97] *আবু দাউদ*, #৪৯৮৫ এবং *মুসনাদ আহমাদ*, #২২৫৭৮।

মুসলিমগণ রমযান মাসে[98] সুবহে সাদিক থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া ও স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা থেকে দূরে থেকে রোজা পালন করেন। এ ছাড়া রোজা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী; একে আত্মিক পবিত্রতার একটি কারিকুলাম হিসেবে দেখা হয়। সামান্য সময়ের জন্য হলেও দুনিয়াবি ভোগ্য জিনিস থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে অভাবী অনাহারীদের অবস্থা তারা বাস্তবে উপলব্ধি করতে পারেন। এভাবে তিনি আত্মিক জীবনে প্রবেশ করতে পারেন।

৫. মক্কায় হজ্জ করা:

সম্পদ ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য জীবনে একবার *হজ্জ* করা ফরজ। প্রতি বছর পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থেকে প্রায় ২ মিলিয়ন তথা ২০ লক্ষ লোক *হজ্জ* করতে মক্কায় আসেন। যদিও মক্কা শরীফ সর্বদা যিয়ারতকারীদের দ্বারা জনাকীর্ণ থাকে, তবে ইসলামী পঞ্জিকার দ্বাদশ মাস *জিলহজ্জ* মাসে হজ্জ আদায় করা হয়। হাজীরা অত্যন্ত সাধারণ পোশাক পরিধান করে থাকেন, যা কৃষ্টি-কালচার ও মানুষের মধ্যে সামাজিক ভেদাভেদ সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করে; ফলে সবাই আল্লাহ তা'আলার সামনে সমানভাবে দণ্ডায়মান হয়।

হজ্জের কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— কা'বা ঘরকে সাতবার তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করা; সাতবার সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সায়ী (দৌড়ানো) করা; যেমনটি করেছিলেন ইসমাইল আ. এর সম্মানিতা মাতা হাজের আ. সন্তানের জন্য পানি তালাশের উদ্দেশ্যে। এরপর হাজীগণ একত্রে আরাফাতের ময়দানে[99] সমবেত হন। সেখানে তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রয়োজন পূরণের দোয়া করে তার কাছে ক্ষমা চান। আরাফাতের এ দিনটি আমাদেরকে কিয়ামতের দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

হজ্জের শেষের দিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়: *ঈদুল আযহা* উদযাপন, যা সালাত আদায়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই *ঈদ* ও রমযান পরবর্তী *ঈদুল ফিতর* ইসলামী পঞ্জিকার বাৎসরিক দুটি ঈদ।

---

[98] "রমযান" মাস ইসলামী চান্দ্র ক্যালেন্ডার হিজরী সালের নবম মাসের নাম।

[99] মক্কা থেকে ১৫ মাইল দূরবর্তী একটি এলাকা।

(ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে http://www.islam-guide.com/pillars ব্রাউজ করতে পারেন।)
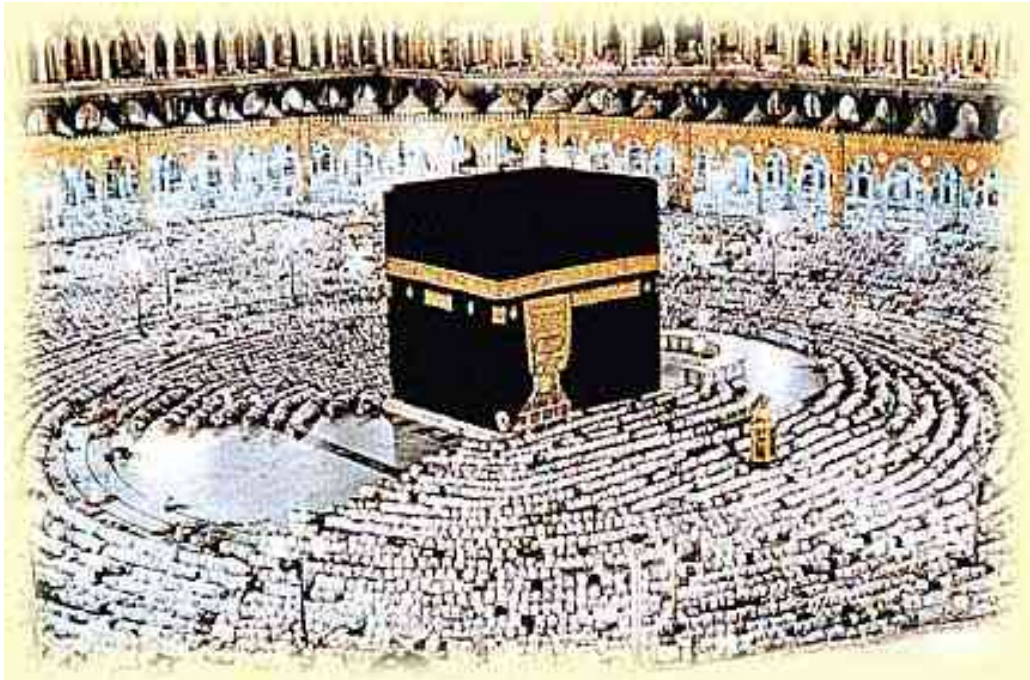
এটি মসজিদুল হারামে হাজীদের সালাত আদায়ের দৃশ্য। এই মসজিদেই কা'বা ঘর অবস্থিত। মুসলিমগণ সেদিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন। কা'বা মুসলিমদের ইবাদাতের কিবলাহ। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম ও ইসমাইল আ. -কে এই ঘর তৈরী করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য

ইসলাম সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে কিংবা ইংরেজি ভাষায় এই বইয়ের প্রিন্ট কপি পেতে ভিজিট করতে পারেন:

http://www.islam-guide.com

বই সম্পর্কিত পরামর্শ ও মন্তব্যের জন্য

এই বই সম্বন্ধে পরামর্শ ও মন্তব্য জানাতে গ্রন্থকার "আই. এ. ইবরাহীম" এর সাথে যোগাযোগ করুন:—

ই-মেইল: ib@i-g.org

টেলিফোন: ০০৯৬৬১৪৫৪১০৬৫

ফ্যাক্স: ০০৯৬৬১৪৫৩৬৮৪২

পোষ্ট বক্স নং: ২১৬৭৯

রিয়াদ-১১৪৫৭

সৌদি আরব

ইসলাম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত পড়ার জন্য

ইসলাম সম্বন্ধে আরও বেশি জানতে হলে পড়ুন-

- *The True Religion*, by Bilal Philips.
- *This is the Truth*, published by Alharamain Islamic Foundation.
- *The Qur'an and Modern Science*, by Dr. Maurice Bucaille, edited by Dr. A. B. Philips.
- *Towards Understanding Islam*, by Abul A'la al-Mawdudi.
- *Life After Death* (pamphlet), by World Assembly of Muslim Youth.
- *The Muslim's Belief*, by Muhammad al-Uthaimin, translated by Dr. Maneh al-Johani.
- *Interpretation of the Meanings of The Noble Qur'an in the English Language*, by Dr. Muhammad Al-Hilali and Dr. Muhammad Khan.

উক্ত গ্রন্থগুলো নিচের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে পারেন:

http://www.islam-guide.com

সহায়ক গ্রন্থাবলি

Ahrens, C. Donald. 1988. *Meteorology Today.* 3rd ed. St. Paul: West Publishing Company.

Anderson, Ralph K.; and others. 1978. *The Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting.* Geneva: Secretarial of the World Meteorological Organization.

Anthes, Richard A.; John J. Cahir; Alistair B. Fraser; and Hans A. Panofsky. 1981. *The Atmosphere.* 3rd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.

Barker, Kenneth; and others. 1985. *The NIV Study Bible, New International Version.* Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House.

Bodin, Svante. 1978. *Weather and Climate.* Poole, Dorest: Blandford Press Ltd.

Cailleux, Andre‘. 1968. *Anatomy of the Earth.* London: World University Library.

Couper, Heather; and Nigel Henbest. 1995. *The Space Atlas.* London: Dorling Kindersley Limited.

Davis, Richard A., Jr. 1972. *Principles of Oceanography.* Don Mills, Ontario: Addison-Wesley Publishing Company.

Douglas, J. D.; and Merrill C. Tenney. 1989. *NIV Compact Dictionary of the Bible.* Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House.

Elder, Danny; and John Pernetta. 1991. *Oceans.* London: Mitchell Beazley Publishers.

Famighetti, Robert. 1996. *The World Almanac and Book of Facts 1996.* Mahwah, New Jersey: World Almanac Books.

Gross, M. Grant. 1993. *Oceanography, a View of Earth.* 6th ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.

Hickman, Cleveland P.; and others. 1979. *Integrated Principles of Zoology*. 6th ed. St. Louis: The C. V. Mosby Company.

Al-Hilali, Muhammad T.; and Muhammad M. Khan. 1994. *Interpretation of the Meanings of The Noble Qur'an in the English Language*. 4th revised ed. Riyadh: Maktaba Dar-us-Salam.

The Holy Bible, Containing the Old and New Testaments (Revised Standard Version). 1971. New York: William Collins Sons & Co., Ltd.

Ibn Hesham, Abdul-Malek. *Al-Serah Al-Nabaweyyah*. Beirut: Dar El-Marefah.

The Islamic Affairs Department, The Embassy of Saudi Arabia, Washington, DC. 1989. *Understanding Islam and the Muslims*. Washington, DC: The Islamic Affairs Department, The Embassy of Saudi Arabia.

Kuenen, H. 1960. *Marine Geology*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Leeson, C. R.; and T. S. Leeson. 1981. *Histology*. 4th ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company.

Ludlam, F. H. 1980. *Clouds and Storms*. London: The Pennsylvania State University Press.

Makky, Ahmad A.; and others. 1993. *Ee'jaz al-Qur'an al-Kareem fee Wasf Anwa' al-Riyah, al-Sohob, al-Matar*. Makkah: Commission on Scientific Signs of the Qur'an and Sunnah.

Miller, Albert; and Jack C. Thompson. 1975. *Elements of Meteorology*. 2nd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.

Moore, Keith L.; E. Marshall Johnson; T. V. N. Persaud; Gerald C. Goeringer; Abdul-Majeed A. Zindani; and Mustafa A. Ahmed. 1992. *Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah*. Makkah: Commission on Scientific Signs of the Qur'an and Sunnah.

Moore, Keith L.; A. A. Zindani; and others. 1987. *Al-E'jaz al-Elmy fee al-Naseyah (The scientific Miracles in the Front of the Head).* Makkah: Commission on Scientific Signs of the Qur'an and Sunnah.

Moore, Keith L. 1983. *The Developing Human, Clinically Oriented Embryology, With Islamic Additions.* 3rd ed. Jeddah: Dar Al-Qiblah.

Moore, Keith L.; and T. V. N. Persaud. 1993. *The Developing Human, Clinically Oriented Embryology.* 5th ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company.

El-Naggar, Z. R. 1991. *The Geological Concept of Mountains in the Qur'an.* 1st ed. Herndon: International Institute of Islamic Thought.

Neufeldt, V. 1994. *Webster's New World Dictionary.* Third College Edition. New York: Prentice Hall.

The New Encyclopaedia Britannica. 1981. 15th ed. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.

Noback, Charles R.; N. L. Strominger; and R. J. Demarest. 1991. *The Human Nervous System, Introduction and Review.* 4th ed. Philadelphia: Lea & Febiger.

Ostrogorsky, George. 1969. *History of the Byzantine State.* Translated from the German by Joan Hussey. Revised ed. New Brunswick: Rutgers University Press.

Press, Frank; and Raymond Siever. 1982. *Earth.* 3rd ed. San Francisco: W. H. Freeman and Company.

Ross, W. D.; and others. 1963. *The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica.* vol. 3. London: Oxford University Press.

Scorer, Richard; and Harry Wexler. 1963. *A Colour Guide to Clouds.* Robert Maxwell.

Seeds, Michael A. 1981. *Horizons, Exploring the Universe.* Belmont: Wadsworth Publishing Company.

Seeley, Rod R.; Trent D. Stephens; and Philip Tate. 1996. *Essentials of Anatomy & Physiology.* 2nd ed. St. Louis: Mosby-Year Book, Inc.

Sykes, Percy. 1963. *History of Persia.* 3rd ed. London: Macmillan & CO Ltd.

Tarbuck, Edward J.; and Frederick K. Lutgens. 1982. *Earth Science.* 3rd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.

Thurman, Harold V. 1988. *Introductory Oceanography.* 5th ed. Columbus: Merrill Publishing Company.

Weinberg, Steven. 1984. *The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe.* 5th printing. New York: Bantam Books.

Al-Zarkashy, Badr Al-Deen. 1990. *Al-Borhan fee Oloom Al-Qur'an.* 1st ed. Beirut: Dar El-Marefah.

Zindani, A. A. *This is the Truth* (videotape). Makkah: Commission on Scientific Signs of the Qur'an and Sunnah.

হাদীসের নাম্বারিং:

গ্রন্থটিতে হাদীস নম্বরের ক্ষেত্রে যে সমস্ত গ্রন্থ সহায়ক ছিল:-

- Saheeh Muslim: according to the numbering of Muhammad F. Abdul-Baqy.
- Saheeh Al-Bukhari: according to the numbering of Fath Al-Bari.
- Al-Tirmizi: according to the numbering of Ahmad Shaker.
- Mosnad Ahmad: according to the numbering of Dar Ehya' Al-Torath Al-Araby, Beirut.
- Mowatta' Malek: according to the numbering of Mowatta' Malek.
- Abu-Dawood: according to the numbering of Muhammad Muhyi Al-Deen Abdul-Hameed.

- Ibn Majah: according to the numbering of Muhammad F. Abdul-Baqy.
- Al-Daremey: according to the numbering of Khalid Al-Saba Al-Alamy and Fawwaz Ahmad Zamarly.

-সমাপ্ত-